দ্বিতীয় সপ্তাহও কি আশাভঙ্গের কার্বন কপি হবে

জলবায়ু সম্মেলন

‘জলবায়ু সংকট সমাধানের উত্তর আমাদের কাছে আছে’ স্লোগানে গতকাল ‘আদিবাসী বৈশ্বিক পদযাত্রায়’ সংহতি জানান হাজারো মানুষ।

পাভেল পার্থ, *বেলেম, ব্রাজিল থেকে*

পাভেল পার্থ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার দাবিতে বিক্ষোভ। গতকাল ব্রাজিলের বেলেম শহরে। ছবি : রয়টার্স

প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে অংশ নেন অনেকেই। গতকাল ব্রাজিলের বেলেম শহরে। রয়টার্স

একটি ছুটির দিন মাঝে রেখে দুই সপ্তাহের জলবায়ু সম্মেলনের কার্যক্রম আবার শুরু হয় ১৭ নভেম্বর। সম্মেলনের প্রতিটি দিন বিশেষ প্রতিপাদ্য (থিম) দিয়ে সাজানো হয়। নতুন সপ্তাহের প্রথম দুই দিনের প্রতিপাদ্য পৃথিবী ও প্রাণের প্রতি দায়িত্ব, অরণ্য, সমুদ্র, প্রাণবৈচিত্র্য, আদিবাসী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিশু ও যুব, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতিবান্ধব সমাধান।

পরের দুদিনের (১৯-২০ নভেম্বর) প্রতিপাদ্য খাদ্যব্যবস্থা, কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, মৎস্য খাত, পারিবারিক কৃষি, নারী, জেন্ডার, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত, পর্যটন ইত্যাদি। হয়তো বরাবরের মতোই বিশ্বনেতাদের মিথ্যা আশ্বাস, অঙ্গীকার ভঙ্গ, বানোয়াট সমাধান আর বিরক্তিকর কালক্ষেপণের মধ্য দিয়েই ২১ নভেম্বর শেষ হবে বেলেম জলবায়ু সম্মেলন।

সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে আমাজনের আদিবাসীদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। নদী আর সড়কপথে, অনেকে শিশু ও পরিবারসহ এসেছে। তাদের গলায় ইউএনএফসিসির নিবন্ধন কার্ড ছিল না। ব্লু জোনের সম্মেলনস্থলে তাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। প্রথম সপ্তাহটি এর প্রতিবাদে মুখর ছিল। ‘জলবায়ু সংকট সমাধানের উত্তর আমাদের কাছে আছে’ স্লোগান নিয়ে এলডেইয়া কপ থেকে লুমাস ভেলেন্টিনাস পর্যন্ত গতকাল ‘আদিবাসী বৈশ্বিক পদযাত্রায়’ সংহতি জানান হাজারো মানুষ।

জীবাশ্ম জ্বালানিকে বৈধতা দেওয়া ১ হাজার ৬০০ লবিস্ট (প্রভাব বিস্তারকারী) সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। বায়ার ক্রপ সায়েন্স ও নেসলের মতো কৃষিবিষ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জলবায়ু সম্মেলনের স্পনসর (পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে আছে। জলবায়ু সম্মেলন যেন প্রাণ ও প্রতিবেশ সংহারী এজেন্সিগুলোর কাছে জিম্মি। এই জিম্মিদশা কাছ থেকে জলবায়ু সম্মেলনকে মুক্ত রাখতে হবে। জলবায়ুকর্মীরা পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধে সপ্তাহজুড়েই বিশ্বনেতাদের হুঁশিয়ার করেছেন।

জলবায়ু সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু হয়নি।

সম্মেলনের দ্বিতীয় সপ্তাহে কী হবে

জানালাবিহীন প্লাস্টিক মোড়ানো সম্মেলনস্থলে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। প্রথম সপ্তাহের ভেতরেও কার্বন দূষণকারী বৃহৎ দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা, চীন, ভারত তাদের এনডিসি জমা দেয়নি।

ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, কলম্বিয়া এবং কেনিয়া জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসতে বৈশ্বিক রোডম্যাপের (পথনকশা) জন্য তাগিদ দেয় প্রথম সপ্তাহে। মূলত বাণিজ্য, অর্থায়ন, দেড় ডিগ্রি উষ্ণতা বিতর্ক এবং জলবায়ু অঙ্গীকারের স্বচ্ছতা নিয়ে পার হয়েছে প্রথম সপ্তাহ। ন্যায্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ বাড়ানো নিয়ে আলাপ হয়েছে। বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রাষ্ট্রগুলোকে অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

জলবায়ু তহবিলের ক্ষেত্রে ‘বাকু টু বেলেম রোডম্যাপ’ এখনো দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য আলোচনার টেবিলে পড়ে থাকছে। ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ‘কোনো দয়া বা ঋণ নয়, অনুদান হিসেবে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ দাবি করে আসছে। জলবায়ু অর্থায়ন আমাদের অধিকার।’

রাষ্ট্রগুলোর অভিযোজন পরিকল্পনা, অভিযোজন তহবিল, বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যমাত্রা, জেন্ডার, ক্ষয়ক্ষতি, পূর্ববর্তী অঙ্গীকার নিয়ে সম্মেলনের দ্বিতীয় সপ্তাহটি সরব থাকবে। ক্রান্তীয় বর্ষারণ্য সুরক্ষায় ঘোষিত ‘ট্রপিক্যাল ফরেস্টস ফর এভার ফান্ড (টিএফএফএফ)’ নামে এক নতুন জলবায়ু তহবিলে ইতিমধ্যে ৫৩টি দেশ সই করেছে। ৫৫০ কোটি ডলারের টিএফএফএফ তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এই চুক্তি সই ও তহবিল আদায় করা জরুরি।

টঙ্ক থেকে টুপিনাম্বা বিদ্রোহ

জলবায়ু সম্মেলনের সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের যখন আমাজন বন কাটা হয়, তখনই আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানান। এ নিয়ে ১৫ নভেম্বর কথা হয় বেলেমের টুপিনাম্বা যুবনেতা জেনেসিস টুবুসার সঙ্গে। তিনি জানান, বন কাটায় রেনডেওয়া মুরুকুটা এলাকার টুপিনাম্বা আদিবাসীরা নতুন সংকটে পড়েছেন। বন্য প্রাণী এবং মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। অনেকে বসতি ছেড়ে শহরে বা বনের আরও ভেতরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মাইরি থেকে বেলেম

একটা প্যাভিলিয়ন থেকে ভিড় সামলে প্রেসকক্ষে আসি, এশিয়ান ইনডিজেনাস পিপলস প্যাক্টের বন্ধুরা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। জলবায়ুকর্মীদের সেই অনানুষ্ঠানিক আড্ডায় দুনিয়াজুড়ে গ্রামীণ নিম্নবর্গের ওপর ঔপনিবেশিকতা ও কর্তৃত্ববাদী জুলুমের গল্প। ১৫ নভেম্বরের সেই আড্ডায় জানতে পারি, বেলেম শহরের আগের নাম ‘মাইরি’। টুপিনাম্বা আদিবাসী ভাষায় এর মানে ‘জ্বলন্ত সূর্য বা গনগনে রোদ’।

১৬১৬ সালে ফ্রান্সিকো কালডেইরা কাসটেলো টুপিনাম্বাদের অঞ্চল মাইরি দখল করে পর্তুগিজ উপনিবেশ জারি করেন। শহরের নতুন নাম হয় বেলেম। ১৬১৭ থেকে ১৬১৯ টুপিনাম্বারা পর্তুগিজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আড্ডায় বাংলাদেশের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু

করে নীল, তেভাগা, ভানুবিল, নানকার, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিও তুলে ধরি। কর্মসূত্রে থাইল্যান্ড থেকে আসা সোহেল হাজং টঙ্ক বিদ্রোহের বিষয়টি যুক্ত করেন।

মাইরি বা বেলেম হলো আমাজন বনে প্রবেশপথ। গুয়ামা নদীর তীরে এই শহর। আমাজন ও টোকানটিসের ধারাও প্রবাহিত হয়েছে মাইরিতে এবং মিশেছে প্যারানা গুয়াকোতে। প্যারানা গুয়াকো নামটিও টুপিনাম্বাদের। এটিও এখন বদলে ‘ওয়াজারা বে’ হয়েছে। সব প্রবাহ গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে। আমাজন বড় নদী। আদিবাসীরা জানালেন, বহু নদী ও প্রবাহের জটিল গ্রন্থি নিয়ে এই জলধারাটি প্রবাহিত। মানাউ বা আমাজোনাসে এর প্রবাহ আরও বহুমাত্রিক। অঞ্চল ও জাতিসত্তাভেদে এর বহু নাম। জলবায়ু সম্মেলনে উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ব্রাজিলের পরিবেশকর্মী ইয়েদা রিভেরা জানান, আমাজনের সব প্রবাহের রং ও স্রোতোধারা এক নয়। দুটি ধারার মিলনস্থলে নানা গতির ‘পোরোরোকা’ (ঢেউ) তৈরি হয়। আর এটি দেখেই বোঝা যায় নদী ও বন কতটা সুস্থ আছে। স্থানীয় নাম ও উচ্চারণগুলো বদলে দিলে বন বা নদীর সঙ্গে সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়।

জল, জঙ্গল, জুম, জমিন থেকে জনপদ। জবরদস্তি ও জুলুমের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশেও পাল্টেছে বহু স্থান নাম ও পরিসর। এটি কেবল সাংস্কৃতিক হেজিমনি নয়, প্রকৃতির ওপরও নিষ্ঠুর ‘অপরায়ণ’। তাজিংডং পাহাড় থেকে বিজয়, সিমসাং নদী থেকে সোমেশ্বরী, মৈলপতুইসা থেকে লাউয়াছড়া বন।

বলিভিয়ার লাপাজ পর্বতের জলবায়ুকর্মী শার্লট পাভাগেয়্যু প্রথম সপ্তাহের এক অধিবেশনে বলেন, বাণিজ্যিক চাষাবাদ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং বহুজাতিক খননের কারণে এলাকার আগের নাম গুলি পাল্টে ফেলা হয়। একই সঙ্গে তাদের বাস্তুতন্ত্রও বদলানো হয়। প্রাচীন নাম গুলি না থাকলে সেই সব পরিবেশের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার কোনো দায়িত্ববোধও তৈরি হয় না।

হারানো মুখ খুঁজে ফেরার গল্প

আফ্রিকা, এশিয়া থেকে উপনিবেশের সময় বহু আদিবাসী ও গ্রামীণ নিম্নবর্গকে জবরদস্তি করে নানা জায়গায় নিয়ে ‘দাস’ বানানো হয়েছে। চা, কফি, নীল, তুলা, আখ, রাবার, তামাক, কোকোয়ার বহুজাতিক বাণিজ্য গড়ে তোলা হয়েছে। আমাজনে অঞ্চলে পর্তুগিজ উপনিবেশের সময় আনা আফ্রিকান বহু আদিবাসী দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাজনে থাকতে শুরু করে। ‘আফ্রিকান বংশোদ্ভূত’ হিসেবে আত্মপরিচয় দেওয়া এই মানুষেরাও আমাজন সুরক্ষার কারিগর এবং একই সঙ্গে নিষ্ঠুর খনি প্রকল্পের ভুক্তভোগী।

আমাজন অঞ্চলে বহুমুখী সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সমন্বয় ঘটেছে। বাংলাদেশ ও ফিলিপিনো কয়েকজন মিলে সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে বেলেমের জেরুনাস এলাকায় ছিলেন। তাদের বাসায় গিয়ে মালিক সেবাস্তিয়ান হেইস ও তাঁর স্ত্রী ওরমিন্ডা সুজিহো হেইসের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের মেয়ে ক্যামিলা হেইসের স্বামী ফ্রাঙ্কলিন ফটারু কিছুটা ইংরেজি জানেন। তিনি আমাদের অনুবাদে সহায়তা করেন। এ ছাড়া গুগল ট্রান্সলেশন ব্যবহার করে আমরা তাদের খাবারকক্ষে বসে আলাপ করি।

সেবাস্তিনের দাদু রোমাইয়ো হেইস ও দাদি সেভদরু রামোস গঞ্জালেস। রোমাইয়োর বাবা ছিলেন একজন টুপিনাম্বা আদিবাসী। সেবাস্তিয়ানের স্ত্রী ওরমিন্ডার বাবা-মা রায়মন্দো দোহালো সসিনহো এবং জোনাস দস সসিনহো ছিলেন পর্তুগিজ। সেবাস্তিনদের জিজ্ঞেস করলাম জলবায়ু সম্মেলন, বহুজাতিক খনন এবং আমাজনের আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে।

সেবাস্তিন কোনো উত্তর দিলেন না, জড়িয়ে ধরলেন, চোখ মুছে টেনে নিলেন এক জন্মদিনে। তাঁদের নাতনি গ্রেসিয়ার জন্মদিন ছিল ১৫ নভেম্বর রাতে। গোলাপি বেলুন, কেক আর খেলনা দিয়ে খুব সাধারণভাবে সাজানো ঘরোয়া জন্মদিন। আত্মীয় পরিজনেরা এসেছেন। মিগুয়েল নামে সেবাস্তিনের স্কুলপড়ুয়া আরেক নাতি ইংরেজিতেই আমাদের জলবায়ু সম্মেলনের কথা জানাল। কেন পরিবেশ রক্ষা করতে হয়, বন বাঁচাতে হয়, সে জানে। স্কুলে তারা গাছ লাগায়। আমাদের নিয়ে ছবি তুললেন সবাই। ‘৯৯’ নামের ট্যাক্সিতে বাসায় ফেরার সময় মনে হলো এই মিগুয়েল আর গ্রেসিয়ারাই আমাদের ভবিষ্যতের জলবায়ু যোদ্ধা। এরাই হয়তো পৃথিবীটাকে বুঝবে।

● **পাভেল পার্থ** লেখক ও গবেষক
animistbangla@gmail.com

উত্তরা ব্যাংক পিএলসি
আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল।
অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (৭) নং ধারা মোতাবেক ডিক্রীদারের অনুকূলে নিলাম প্রস্তাবিত সম্পত্তিতে ডিক্রিদারের মালিকানা স্বত্ব অর্জন এর বলে

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, শাখার ঋণ গ্রহীতা **জনাব উজ্জল চন্দ্র পাল**, পিতা: নিখিল চন্দ্র পাল, মাতা: রেনু বালা পাল, চাউল বাজার, থানা-রাজবাড়ী সদর, জেলা-রাজবাড়ী। তার মালিকানাধীন **মেসার্স উজ্জল চন্দ্র পাল** নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, রাজবাড়ী শাখা, রাজবাড়ী হতে ১,৩০,০০,০০০/- (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) সি সি (হাইপো) ঋণ গ্রহণ করেন এবং উল্লেখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট রেজিস্ট্রি বন্ধক রাখেন। বারবার তলব ও তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।
অতঃপর অর্থঋণ আদালত, রাজবাড়ীতে অর্থঋণ মামলা নং-১৫/২০১৮ এবং পরবর্তীতে অর্থঋণ জারী মামলা নং- ০৮/২০২০ রুজু করা হয়। অতঃপর বিজ্ঞ আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক ডিক্রীদারের অনুকূলে নিলাম প্রস্তাবিত সম্পত্তিতে ডিক্রিদারের মালিকানা স্বত্ব অর্জন সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। বিগত ০৭/০৯/২০২৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সুদসহ ব্যাংকের সর্বমোট পাওনা টাকা ২,৬২,৪৮,৯০২.৬৫ (দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত দুই টাকা পয়ষট্টি পয়সা) মাত্র। ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট ও উল্লেখিত আইনের বিধানবলে নিম্নলিখিত তফসিত বর্ণিত বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রী করার জন্য সীল মোহরকৃত দরপত্র নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আহ্বান করা যাচ্ছে।
আগ্রহী ক্রেতাগণ কর্তৃক আগামী ১৭/১২/২০২৫ ইং তারিখ বেলা ১ (এক) ঘটিকার মধ্যে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, রাজবাড়ী শাখা, জলিল খান সুপার মার্কেট, প্রধান সড়ক, রাজবাড়ী-৭৭০০ তে রক্ষিত বাক্সে দরপত্র জমা করতে অথবা খামের উপর "সম্পত্তি ক্রয় দরপত্র" লিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে উক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। ওই দিন বেলা ৩ (তিন) ঘটিকার সময় দরপত্র দাতা কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র সমূহ খোলা হবে। দরপত্র অবশ্যই শর্ত মুক্ত হতে হবে। বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উত্তরা ব্যাংক পিএলসি এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার আকারে নিম্নরূপ আমানত দরপত্রের সাথে দাখিল এবং বর্ণিত পরিশোধ সূচি অনুযায়ী বাকী টাকা পরিশোধ করতে হবে ঃ

দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য	জামানত	দরপত্রের বাকী টাকা পরিশোধের সময়সীমা
অনুর্ধ্ব টাকা ১০,০০,০০০/-	২০%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন
টাকা ১০,০০,০০১/- হতে অনুর্ধ্ব টাকা ৫০,০০,০০০/-	১৫%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন
টাকা ৫০,০০,০০০/- এর অধিক	১০%	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন

দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর উপরেল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাকী টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। প্রকাশ থাকে যে, দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হলে অথবা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন/সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
তফসিল ভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির যে কোন পাওনা বা দাবী থাকলে তা পরিশোধের কোন দায় দায়িত্ব অত্র ব্যাংকের উপর বর্তাবেনা। ইহা ছাড়া দরপত্র দাতাকে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত খরচ, স্ট্যাম্প ডিউটি ও অন্যান্য শুল্ক যদি থাকে এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হবে।

তফসীল

থানা ঃ রাজবাড়ী সদর, মৌজাঃ জে.এল নং ১১১, বিনোদপুর, খতিয়ান ঃ এস.এ-৬৯৪, (বি.এস-৪২২), (প্রভাবিত-১৫৪৮), এস.এ-১১৪২, (বি.এস-২১৮০), (প্রস্তাবিত-১১৪২/৩), দাগ নং- আর.এস-১৬৪০ (বি.এস-২৯৬৮), আর.এন-১৪৬৬ (বি.এস-২৬২৬), বন্ধকী জমি ঃ ১.৭০ শতাংশ, ২.৫৫ শতাংশ।

উপমহাব্যবস্থাপক (বরিশাল আঞ্চলিক প্রধান)

INVITATION FOR TENDER

Pubali Bank PLC., the largest Private Commercial Bank in Bangladesh is hereby inviting sealed Tenders from the eligible Tenderers, who can participate in any of the following tenders, but in separate envelope by fulfilling all the conditions as defined in the tender documents. Interested bidders are requested to participate as per below time schedule:

Tender-ID	Tender name	Last Date & Time for Tender		Tender Opening Date & Time
		Selling	Submission	
E&GSD/OTM /149/2025	**Civil & Electrical works** at our Bank's Own Building (Ground Floor, Stair, Roof top & external work with curtain glass wall), Mymensingh.	06:00 PM 27/11/2025	11:00 AM 30/11/2025	11:30 AM 30/11/2025
E&GSD/OTM /150/2025	**Civil, Electrical and Networking works** at present premises (1st & 2nd floor) of our Kawran Bazar Corporate Branch, Dhaka.			

Please visit our web site, **https://www.pubalibangla.com/tender.aspx** for details.

Md. Kamruzzaman
General Manager & Division Head

পূবালী ব্যাংক পিএলসি.
PUBALI BANK PLC.

Establishment & General Services Division
Head office, 26 Dilkusha C/A, Dhaka.

CamScanner

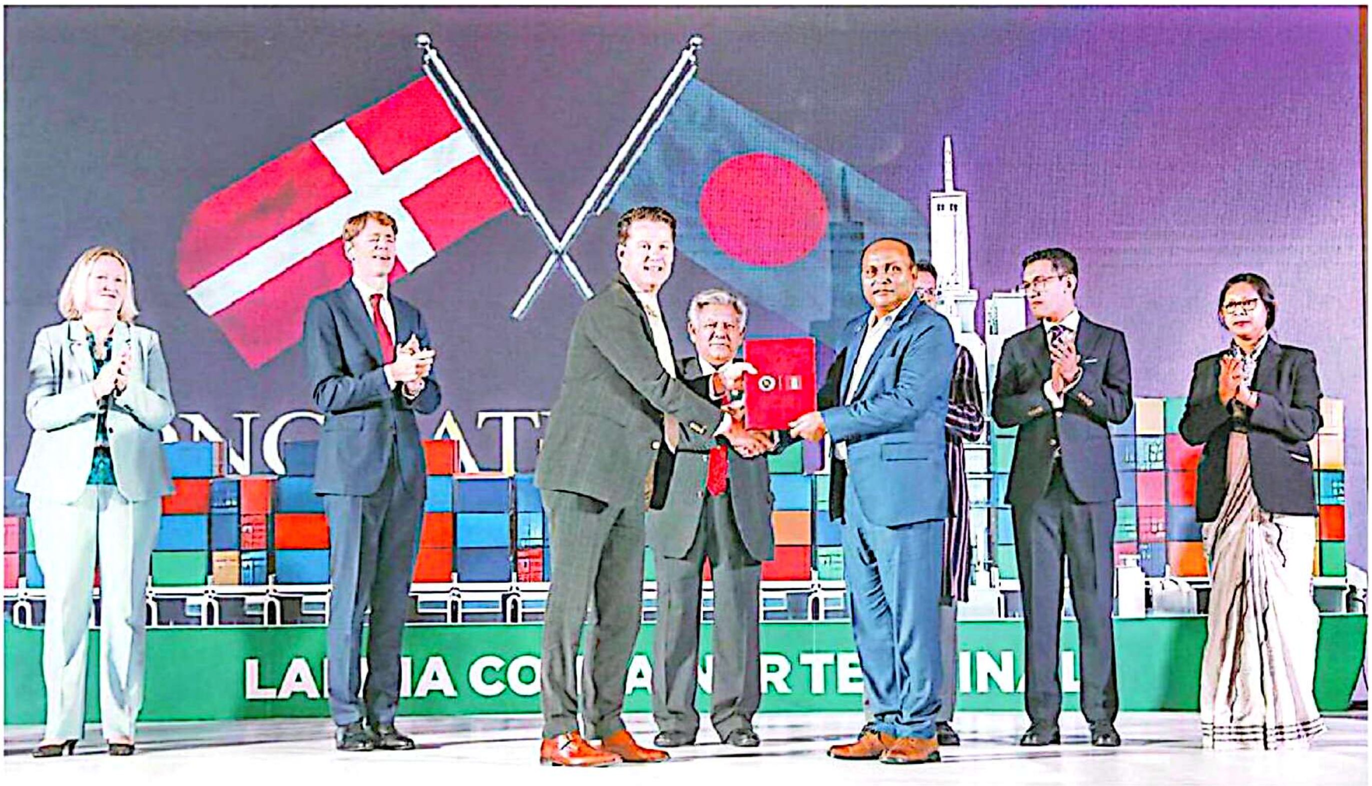

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বন্দরের সঙ্গে ডেনমার্কের মালিকানাধীন এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। গতকাল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। ছবি: প্রথম আলো

দুই টার্মিনাল যাচ্ছে বিদেশিদের হাতে

চুক্তি সই

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা এবং ঢাকার পানগাঁও নৌ টার্মিনাল পরিচালনার বিষয়ে আলাদা চুক্তি সই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের দুটি টার্মিনাল নিয়ে চুক্তি সই হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীর তীরে লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা নিয়ে একটি এবং ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল পরিচালনার বিষয়ে অন্য চুক্তিটি হয়।

গতকাল সোমবার ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত পৃথক দুই অনুষ্ঠানে চুক্তি দুটি সই হয়েছে। তবে স্বাক্ষরটা প্রকাশ্যে হলেও চুক্তিতে বিস্তারিত কী কী শর্ত রয়েছে এবং কী কী তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। যদিও নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেছেন, চুক্তির বিভিন্ন শর্তের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এদিকে চুক্তির বিরোধিতা করে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষ বিবৃতি দিয়েছে।

লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে করা চুক্তিতে সই করেন ডেনমার্কভিত্তিক এপিএম টার্মিনালসের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টেইন ভ্যান ডোঙ্গেন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান। এ সময় ডেনমার্কের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইবিএস এপিএম টার্মিনালসের হেড অব ইনভেস্টমেন্ট ভাস্কর সেনগুপ্ত, ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্টেট সেক্রেটারি লিনা গান্ডলোসে হ্যানসেন ও বাংলাদেশে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলার। আর বাংলাদেশের পক্ষে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আশিক চৌধুরী ও নৌপরিবহন সচিব নুরুন্নাহার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হোন ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোক্কে রাসমুসেন।

> এই চুক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জন্য বড় অবদান। যাঁদের মধ্যে চুক্তি নিয়ে সন্দেহ ছিল, আশা করি তা দূর হবে।
>
> **এম সাখাওয়াত হোসেন,** নৌপরিবহন উপদেষ্টা

অন্যদিকে পানগাঁও নৌ টার্মিনালবিষয়ক চুক্তিতে সই করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান ও মেডলগ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ টি এম আনিসুল মিল্লাত। এখানেও নৌপরিবহন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি অনুসারে, চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং ৩০ বছরের জন্য এটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে ডেনমার্কের এপি মোলার মায়ের্স্ক গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) আওতায় এ টার্মিনাল নির্মাণের জন্য কোম্পানিটি ৫৫ কোটি ডলার বা প্রায় ৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পরপরই ২৫০ কোটি টাকা 'সাইনিং মানি' হিসেবে পেয়েছে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, ২২ বছরের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মেডলগ এসএর হাতে। এ টার্মিনালে মোট ৪ কোটি ডলার বা প্রায় ৪৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে মেডলগ। এ ক্ষেত্রে সাইনিং মানি হিসেবে তারা বাংলাদেশকে দিয়েছে ১৮ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, লালদিয়া টার্মিনালে বছরে আট থেকে দশ লাখ একক কনটেইনার ওঠানো-নামানোর সক্ষমতা থাকবে। এর মধ্যে আট লাখ পর্যন্ত প্রতি একক কনটেইনারে ২১ ডলার (প্রায় ২ হাজার ৫০০ টাকা) করে পাবে সরকার। আর আট লাখের বেশি কনটেইনার ওঠানো-নামানো হলে প্রতি একক কনটেইনারের জন্য পাবে ২৩ ডলার করে। অন্যদিকে পানগাঁও নৌ টার্মিনালে বছরে ১ লাখ ৬০ হাজার একক কনটেইনার হ্যান্ডলিং হবে বলে জানিয়েছে মেডলগ। প্রতি একক কনটেইনার থেকে ২৫০ টাকা করে পাবে সরকার।

লালদিয়া টার্মিনালের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'এই চুক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জন্য বড় অবদান। যাঁদের মধ্যে চুক্তি নিয়ে সন্দেহ ছিল, আশা করি তা দূর হবে।'

বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া মায়ের্স্ক লাইনের চেয়ারম্যান রবার্ট মেয়ার্ক উগলা বলেন, লালদিয়া হবে অত্যাধুনিক গ্রিনফিল্ড টার্মিনাল; সেখানে নিরাপত্তা, অটোমেশন ও স্থায়িত্বের সর্বোচ্চ মান থাকবে। এতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে।

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়ার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে গতকাল পৃথক বিবৃতি দিয়েছে চট্টগ্রাম শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম।

CS CamScanner

প্রথম আলো

জলবায়ু ন্যায়বিচার ও বনভূমি সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভে ব্রাজিলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যরা। গতকাল দেশটির বেলেমে। ছবি : রয়টার্স

আগামী জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজন নিয়ে মতবিরোধ

ব্রাজিল জলবায়ু সম্মেলন

এএফপি, *সিডনি*

আগামী বছরের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩১) তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রাজিলের বেলেমে চলমান বৈঠকে কপ৩১-এর আয়োজক হতে আগ্রহ দেখিয়েছে দুই দেশ। তবে আয়োজক হওয়া নিয়ে দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। এ অচলাবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য ক্যানবেরা ও আঙ্কারার ওপর চাপ বাড়ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবারের আয়োজক ব্রাজিল যেকোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে চাইছে। ব্রাজিল চাইছে জলবায়ু কূটনীতি এখনো কার্যকর, সেটি প্রমাণ করতে। সাধারণত জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করতে চাইলে সব দেশের সম্মতি লাগে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া বা তুরস্ক কেউই তাদের আয়োজক হওয়ার প্রস্তাব থেকে সরে না দাঁড়ালে বা যৌথ আয়োজন নিয়ে সমঝোতায় না পৌঁছালে উভয় দেশই কপ৩১ আয়োজনের সুযোগ হারাবে। সে ক্ষেত্রে কপ৩১ আয়োজনের ভার পাবে জার্মানি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ গতকাল বলেন, তুরস্কের সঙ্গে যৌথ আয়োজন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সবাই জানে, এটি কোনো বিকল্প নয়। তাই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তুরস্কের একজন কূটনৈতিক বলেন, আঙ্কারা যৌথ মডেলকে সমর্থন করছে, ঐকমত্য না হলে একাই আয়োজনে প্রস্তুত।

অস্ট্রেলিয়া তার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর অ্যাডিলেডে প্রতিবেশী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে চাইছে। অস্ট্রেলিয়ার আশা, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়া অঞ্চলগুলোকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নেতারা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, কপ সম্মেলনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হয়।

CamScanner

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের যে ধারাটি ত্রুটিপূর্ণ

মো. আসাদুজ্জামান

সমকালীন প্রসঙ্গ

সরকার সম্প্রতি 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এ আইনের ৫০-এর (৪ক) ধারা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নম্বর আইন)-এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের মূল যুক্তি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (ডিএসএ)-এর বিতর্কিত যেসব ধারা বাতিল করা হয়েছে, সেগুলো ছিল 'কুখ্যাত' এবং 'স্পিচ অফেন্স' বা মতপ্রকাশ দমনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী সাইবার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার প্রায় ৯৫ শতাংশই এসব নিপীড়নমূলক ধারায় দায়ের করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপকে তাই একটি সাধারণ আইনি সংস্কার হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটি ছিল একটি 'পরিবর্তনকালীন ন্যায়বিচার' বা বৈপ্লবিক রাজনৈতিক-আইনি পদক্ষেপ। সবচেয়ে গুরুতর সমালোচনার দিকটি হলো এর 'আইনি দ্বৈততা'। সরকার ডিএসএ-এর ২৮ ধারাকে (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত) এতটাই 'জনবিরোধী' মনে করল যে, তার অধীনে প্রদত্ত দণ্ড পর্যন্ত বাতিল করে দিল। অথচ সেই একই সরকার নতুন সুরক্ষা অধ্যাদেশের ২৬ ধারায় 'জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষ'-এর মতো প্রায় একই ধরনের অপরাধ বহাল রেখেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, অন্তর্বর্তী সরকার নীতিগতভাবে অপরাধকে বাতিল করেনি, বরং রাজনৈতিকভাবে পূর্ববর্তী সরকারের দায়েরকৃত মামলাগুলো বাতিল করতে চেয়েছে। এটি আইনের শাসনের বদলে 'আইনি সুবিধাবাদ'-এর এক নজির স্থাপন করে।

যখন আইন উপদেষ্টা বা সরকারের প্রতিনিধিরা অভিযুক্তদের মুক্তির ঘোষণা দেন, তখন তারা বাদীদের আইনি প্রতিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। এই নীরবতাই সমালোচনার মূল বিষয়। ডিএসএর অপব্যবহার হয়েছে, তার মানে এই নয় যে সব মামলাই হয়রানিমূলক ছিল। হাজার হাজার মামলার মধ্যে এমন অনেক মামলাই ছিল, যা প্রকৃত সাইবার অপরাধের যেমন ব্ল্যাকমেইলিং, প্রতিশোধমূলক পর্নোগ্রাফি, গুরুতর হয়রানি, বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের প্রতিকার চেয়ে দায়ের করা হয়েছিল। যেসব বাদী (ভুক্তভোগী) হয়রানির প্রতিকার চেয়ে মামলা করেছিলেন, তারা তাদের মামলা বাতিল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্র কার্যত এক শ্রেণির ভুক্তভোগীকে (ডিএসএতে অভিযুক্ত) ন্যায়বিচার দিতে গিয়ে আরেক শ্রেণির ভুক্তভোগীকে (মূল বাদী) ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছে।

> সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪ক) ধারা আইনগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এটি 'প্রক্রিয়াগত ন্যায়বিচার'-এর চেয়ে 'তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সমাধান'কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে ন্যায়বিচারের নামে একটি গভীর ন্যায়বিচারহীনতা তৈরি হয়েছে। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা দিতে আইন প্রণয়ন করেছিল, সেই রাষ্ট্রই তার আইনি অবকাঠামোতে প্রকৃত ভুক্তভোগীদের আইনি প্রতিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

সমকাল

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪ক) ধারা আইনগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এটি 'প্রক্রিয়াগত ন্যায়বিচার'-এর চেয়ে 'তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সমাধান'কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে ন্যায়বিচারের নামে একটি গভীর ন্যায়বিচারহীনতা তৈরি হয়েছে। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা দিতে আইন প্রণয়ন করেছিল, সেই রাষ্ট্রই তার আইনি খামখেয়ালিপনায় প্রকৃত ভুক্তভোগীদের (যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং, বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের শিকার) আইনি প্রতিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

বাদীদের বলা হচ্ছে 'নতুন করে মামলা করতে'। কিন্তু এটি একটি সরল প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি বাদীর জন্য একটি নতুন 'আইনি দুঃস্বপ্ন'। সাইবার অপরাধের প্রমাণ (ডিজিটাল লগ, সার্ভার ডেটা, আইপি অ্যাড্রেস) অত্যন্ত ভঙ্গুর। মামলা বাতিল ও নতুন করে দায়ের করার এই দীর্ঘ সময়ে অপরাধীর পক্ষে সেই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মুছে ফেলা প্রায় নিশ্চিত। ফলে নতুন মামলা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। যে নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়ে একবার মামলা করার ট্রমা পার করেছেন, তাঁকে ফের একই দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটি ভুক্তভোগীর প্রতি রাষ্ট্রের চরম উদাসীনতার পরিচায়ক।

এই জটিল আইনি ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত ন্যায়বিচার ও সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি বিশেষ কমিটি বা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা, যারা ধারা ৫০(৪ক)-এর অধীনে বাতিল হওয়া সব মামলা পর্যালোচনা করবে।

■ **মো. আসাদুজ্জামান: সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়**
asad@law.ku.ac.bd

CamScanner

Misuse of climate fund must be stopped

Stopping the misuse of climate funds is not simply an institutional duty. It is a moral imperative. Bangladesh's resilience-and its credibility-depends on it

writes

Mir Mostafizur Rahaman

By 2050, one in every seven people in Bangladesh will be displaced due to negative impacts of climate change —Representational Image

Bangladesh, one of the world's most climate-exposed nations, has recently got a sobering reminder how vulnerable its own governance systems remains in the face of an unfolding planetary emergency. The latest findings of the Transparency International Bangladesh (TIB) reveal that more than half of the Bangladesh Climate Change Trust (BCCT) Fund-set up specifically to help communities withstand the rising seas, intensifying cyclones and creeping salinity-has been lost to corruption, political favouritism and sheer administrative decay.

It is a scandal of extraordinary scale, and one that risks undermining both domestic resilience and international confidence at a time when Bangladesh can least afford it.

Between 2010 and 2024, the BCCT approved 891 projects with a combined allocation of USD 458.5 million, or roughly Tk 38.96 billion. TIB's investigation found that irregularities consumed USD 248.4 million-Tk 21.10 billion-during the same period. The culprits form a depressingly familiar cast: politically connected power brokers, members of the fund's own governing board and sections of implementing agencies tasked with delivering projects to some of the poorest and most climate-exposed communities on Earth.

The timing of this disclosure could hardly be worse. In Brazil, climate activists and negotiators are pressing wealthy nations to increase funding for vulnerable countries such as Bangladesh. Scientists warn that rising global temperatures could render parts of the country uninhabitable within decades. And yet, just as Bangladesh seeks to make the case for fairer climate finance flows, it is forced to reckon with a scandal that weakens its moral authority and raises uncomfortable questions about whether future climate funds-however meagre or delayed-will be spent as intended.

The irony is painful. Bangladesh receives a fraction of the money it needs to confront the scale of climate devastation. Experts estimate that the country requires more than USD 12 billion annually to protect communities from floods, cyclones, droughts and salinity intrusion. But from 2003 to 2024, it secured only USD 1.2 billion from international and national climate finance mechanisms. Against such a backdrop, losing Tk 2.0 billion or more to corruption is not merely irresponsible; it is cruel. The loss is borne not by bureaucracies but by families living on eroding riverbanks, farmers battling saline soils, and women walking miles for clean water. It is measured in shattered livelihoods rather than spreadsheets.

The BCCT was created with domestic resources at a time when the global climate finance architecture repeatedly failed to deliver. It was, in essence, a declaration of agency: a recognition that Bangladesh could not wait for international generosity to materialise. That such a fund has now become a playground for political patronage is not only a national embarrassment but also a betrayal of its founding purpose. This is public money, collected from citizens who have every right to expect that the state will protect them from climate threats-not funnel resources into pet projects or private pockets.

What TIB describes is not administrative sloppiness but systemic rot. Projects were routinely approved without robust feasibility studies or environmental assessments. Monitoring was perfunctory; audits, where they existed, were weak. Selection of projects often appeared driven by partisan interests rather than scientific need. In some cases, projects were approved for areas with low climate vulnerability while high-risk regions remained neglected. If this were any other sector, the waste would be dismaying. In the climate sector, it is catastrophic.

The Climate Change Trust Act of 2010, once heralded as a pioneering framework in South Asia, has clearly not kept pace with the governance challenges that followed. Over time, the checks and balances intended to safeguard the fund have eroded. Oversight has weakened. Transparency has declined. The fund became, in effect, vulnerable to exactly the kind of political capture that climate finance experts have long warned about. Reform is no longer a recommendation; it is an urgent necessity.

TIB's nine-point proposal offers a roadmap that policymakers would be wise to take seriously. At the heart of its recommendations is the need to amend the Climate Change Trust Act and create an independent oversight institution with real authority to scrutinise allocation, implementation and auditing. Full public disclosure of project information-from approval to completion-should be mandatory. Procurement processes must be modernised, digitised and transparent. Most importantly, those implicated in corruption should face prosecution, not quiet transfers or administrative pardons.

Bangladesh cannot afford to treat climate finance theft as a minor administrative lapse. It is, in every sense, a crime against the public interest-one that places vulnerable communities directly in harm's way. Corruption erodes the state's ability to respond to cyclones. It weakens embankments that protect millions. It deprives farmers of adaptive technologies that could save their crops. And, not least, it tarnishes the country's image at a time when global solidarity is already fragile.

Yet while the domestic failures are grave, they should not obscure a parallel truth: Bangladesh has been systematically short-changed by the global north. Wealthier nations have failed for years to meet their climate finance commitments. Pledges are slow, inconsistent and often tied to bureaucratic conditions that delay disbursement. In international negotiations, vulnerable countries routinely find themselves fighting uphill battles against shifting goalposts and unfulfilled promises.

But what the TIB revelations demonstrate is that domestic governance matters just as much as international justice. Corruption at home does not absolve the global north of its obligations. But nor does global injustice excuse internal mismanagement. For Bangladesh to argue persuasively on the world stage for increased adaptation financing, it must demonstrate that it has robust mechanisms to use such funds effectively.

The moral stakes are immense. Climate change is not a distant or abstract threat for Bangladesh; it is an ongoing emergency. Every year, families lose their homes to rising waters. River erosion displaces entire communities. Salinity destroys farmland. Cyclones intensify, leaving long trails of devastation. In such a context, climate money is not merely developmental-it is existential. Misusing it is not mismanagement; it is sabotage.

Bangladesh now faces a choice. It can continue with business as usual, allowing climate funds to be captured by vested interests and leaving vulnerable communities exposed. Or it can seize this moment to rebuild trust, strengthen oversight and send a clear message that corruption will not be tolerated-especially not in a sector that determines whether millions can withstand the storms ahead.

Stopping the misuse of climate funds is not simply an institutional duty. It is a moral imperative. Bangladesh's resilience-and its credibility-depends on it.

mirmostafiz@yahoo.com

CamScanner

নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক আতঙ্ক

ড. মতিউর রহমান

মিডিয়া ও রাজনীতিতে একধরনের দ্বৈত চিত্র গড়ে উঠেছে—‘দেবদূত এআই’ বনাম ‘দানব এআই’। কেউ বলে এটি বিশ্বকে রক্ষা করবে, কেউ বলে এটি মানবজাতিকে বিলুপ্ত করবে। এই বৈপরীত্য আসলে নৈতিক এক টানাপড়েন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রযুক্তি সব সময়ই একধরনের বিস্ময় ও ভয়ের উৎস হয়ে এসেছে। মুদ্রণযন্ত্র থেকে শুরু করে বাষ্প ইঞ্জিন পর্যন্ত, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবন সমাজের নৈতিক কাঠামোকে নাড়িয়ে দিয়েছে, মানুষকে বাধ্য করেছে পুনরায় ভাবতে—মানুষ কে, যন্ত্র কী, আর সৃষ্টির সীমা কোথায়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ও সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ—যা একদিকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্যদিকে ধ্বংসের আশঙ্কা জাগায়। আজকের পৃথিবীতে এআই নিয়ে যে আলোড়ন, সেটি কেবল প্রযুক্তিগত নয়; এটি একধরনের নৈতিক আতঙ্ক, যার পেছনে লুকিয়ে আছে নতুন এক বিশ্বাসব্যবস্থা—একটি ধর্মীয় রূপক, যেখানে প্রযুক্তিই হয়ে উঠছে সর্বোচ্চ শক্তি।

এই নৈতিক আতঙ্কের উৎস সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গভীর। কেন মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এত ভয় করে, আবার ততটাই শ্রদ্ধাও করে? কারণ, মানুষ তার বিশ্বাসের কেন্দ্র হারিয়ে ফেলেছে। ঐতিহ্যগত স্পিরিচুয়াল কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ার পর আধুনিক সমাজ এখন প্রযুক্তিতে খুঁজছে সেই ভরসা। আজকের পৃথিবীতে সিলিকন ভ্যালি হয়ে উঠেছে নতুন মন্দির, প্রোগ্রামাররা নতুন পুরোহিত, আর অ্যালগরিদমগুলো যেন নতুন ভবিষ্যদ্বাণী। ডেটা, কোড আজ বিধান, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এক সত্তা। এআইকে ঘিরে যে মুক্তির প্রতিশ্রুতি—দারিদ্র্য দূর করা, অসুখ নিরাময়, এমনকি মৃত্যুকেও অতিক্রম করা—তা একেবারে বিশ্বাস-মুক্তির ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে।

দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম বলেছিলেন, ‘পবিত্র’ মানে কোনো অলৌকিক বিষয় নয়; বরং সেটিই পবিত্র, যেটিকে সমাজ একসঙ্গে সম্মান ও ভয় করতে শেখে, যাকে ঘিরে মানুষেরা নৈতিক অর্থ নির্মাণ করে। আজকের সমাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই অবস্থান নিয়েছে। খুব কম মানুষই জানে কীভাবে ডিপ লার্নিং বা নিউরাল নেটওয়ার্ক কাজ করে, কিন্তু সবাই তার ফলাফলকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়। এর অস্বচ্ছতা, এর রহস্য, এর অপ্রত্যাশিত ক্ষমতা—সবকিছু মিলিয়ে এআই যেন এক আধুনিক অদৃশ্য শক্তি, যার সিদ্ধান্ত মানববোধের ঊর্ধ্বে।

এই প্রযুক্তি ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের আচরণ। মানুষ এখন প্রার্থনা করে না, বরং আপডেট দেয়। প্রতিদিন স্মার্টফোনের স্ক্রিনে স্ক্রল করা, লাইক দেওয়া, পোস্ট শেয়ার করা—এসব আচরণ যেন এক ডিজিটাল ধর্মীয় রীতির অংশ। মানুষ তার গোপনীয়তা, মনোযোগ, এমনকি আবেগ পর্যন্ত উৎসর্গ করছে এই অদৃশ্য অ্যালগরিদমিক শক্তির কাছে, বিনিময়ে পাচ্ছে সুবিধা, সংযোগ, আর পরিচয়বোধ। এই নতুন নৈতিক সম্প্রদায়টি দুর্খাইমের ভাষায় একধরনের ‘collective conscience’—যেখানে প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি।

তবে এই প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বাসও জন্ম দিয়েছে ভয় ও অনিশ্চয়তা। একদিকে এআইকে বলা হচ্ছে মানবমুক্তির হাতিয়ার, অন্যদিকে এটিকে দেখা হচ্ছে ধ্বংসের দূত হিসেবে। মিডিয়া ও রাজনীতিতে একধরনের দ্বৈত চিত্র গড়ে উঠেছে—‘দেবদূত এআই’ বনাম ‘দানব এআই’। কেউ বলে এটি বিশ্বকে রক্ষা করবে, কেউ বলে এটি মানবজাতিকে বিলুপ্ত করবে। এই বৈপরীত্য আসলে নৈতিক এক টানাপড়েন, যেখানে সমাজ একদিকে প্রযুক্তির শক্তিকে স্বীকার করছে, আবার অন্যদিকে সেই শক্তির নৈতিক সীমা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানলি কোহেন যে ‘moral panic’ ধারণাটি দিয়েছেন, তার সঠিক প্রতিফলন এই এআই-ভীতি। কোনো নতুন ঘটনা সমাজের প্রচলিত নৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করলে, সমাজ অতিরঞ্জিত ভয়ের মাধ্যমে নিজেকে পুনর্গঠিত করে। এআইকে নিয়ে যে আতঙ্ক—‘এআই মানুষকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেবে’, ‘এআই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে’, ‘এআই আত্মসচেতন হয়ে উঠবে’—এসব ভয় বাস্তবতার চেয়েও বেশি সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ আসলে তার মানবিক মর্যাদা পুনর্নিশ্চিত করতে চায়, ঘোষণা করতে চায় যে প্রযুক্তি যতই বুদ্ধিমান হোক, নৈতিকতার কেন্দ্র মানুষই থাকবে।

এই নৈতিক আতঙ্ক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের দ্বন্দ্বকেও উন্মোচিত করে। একসময় যাজকরা সিদ্ধান্ত দিতেন কে পাপী আর কে মুক্ত, এখন সেই সিদ্ধান্ত নেয় অ্যালগরিদম—কে ঋণ পাবে, কে চাকরি পাবে, কার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তন কেবল প্রযুক্তিগত নয়, এটি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। মানবজীবনের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ এক অদৃশ্য তথ্যভিত্তিক কাঠামোর হাতে চলে গেছে।

ম্যাক্স ওয়েবার বলেছিলেন, আধুনিকতা মানে ‘disenchantment’—যেখানে জাদু ও রহস্য হারিয়ে যায়, আর মানুষ হয়ে পড়ে যান্ত্রিক। কিন্তু এআই সেই বৃত্তটি ভেঙে দিয়েছে। এটি আবারও একধরনের ‘re-enchantment’ ফিরিয়ে এনেছে—এবার বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে। মানুষ আবার মুগ্ধ হচ্ছে প্রযুক্তির ‘অলৌকিকতা’ দেখে। চ্যাটবট লিখছে কবিতা, রোবট আঁকছে ছবি, অ্যালগরিদম ভবিষ্যৎ অনুমান করছে—এসব দেখে মনে হচ্ছে যেন বিজ্ঞানের ছায়ায় আবার জেগে উঠেছে এক পুরোনো আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গোপন রহস্য জানার বাসনা। এই বিস্ময় একদিকে জ্ঞানচর্চার অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে ভয়—যদি মানুষ নিজেই হয়ে ওঠে অপ্রয়োজনীয়।

তবে সব নৈতিক আতঙ্কই ক্ষতিকর নয়। দুর্খাইমের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এ ধরনের আতঙ্ক অনেক সময় সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়, তার নৈতিক সীমা পুনর্নির্ধারণ করে। আজকের এআই-নৈতিকতা, ‘ethical AI’, ‘responsible technology’ বা ‘AI for good’ নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা আসলে সমাজের সেই নৈতিক আত্মসমালোচনার প্রকাশ। মানুষ চেষ্টা করছে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে একটি নতুন নৈতিক ভারসাম্য খুঁজে পেতে। কিন্তু দুর্খাইম আমাদের মনে করিয়ে দেন—নৈতিকতা ওপরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; এটি গড়ে ওঠে সমাজের সম্মিলিত চেতনা থেকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই নৈতিক প্রশ্নের ভিন্ন মাত্রা আছে। এখানে এআইকে দেখা হয় উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে—দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো। কিন্তু এর মধ্যেও নৈতিক দোটানা আছে। স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি শ্রমজীবীদের জীবিকা হুমকিতে ফেলছে, নজরদারি প্রযুক্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংকুচিত করছে, আর অ্যালগরিদমিক সিদ্ধান্ত অনেক সময় সামাজিক বৈষম্যকে আরো পোক্ত করছে। ফলে, উন্নয়নমূলক আশার পেছনেও লুকিয়ে আছে এক নীরব নৈতিক অস্থিরতা—কে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রযুক্তিকে, আর প্রযুক্তি কাকে নিয়ন্ত্রণ করছে?

দার্শনিক স্তরে এআই এক নতুন প্রতিশ্রুতি বহন করে—অমরত্বের, পরিপূর্ণতার, সর্বজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি। ট্রান্সহিউম্যানিজম বা ‘post-human’ ধারণা বলে, মানুষ একদিন প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের সীমা অতিক্রম করবে। এটি একধরনের আধুনিক মুক্তির তত্ত্ব—ঈশ্বর নয়, কোড আমাদের রক্ষা করবে। মৃত্যু হবে প্রযুক্তিগত ত্রুটি, আর পরকাল হবে ক্লাউড সার্ভারে সংরক্ষিত চেতনা। কিন্তু এই ভাবনা যত আকর্ষণীয়, ততই বিপজ্জনক; কারণ এটি মানবিক অসম্পূর্ণতার সৌন্দর্য ভুলিয়ে দেয়।

আজকের ডিজিটাল সমাজে দেখা যাচ্ছে এক নতুন শ্রেণিবিভাগ—যারা প্রযুক্তি তৈরি করে আর যারা তার অধীন। যারা সংযুক্ত তারা ‘নতুন নাগরিক’, যারা বাদ পড়ে তারা ‘অদৃশ্য মানুষ’। প্রকৃত সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে হলে প্রযুক্তির এই নৈতিক বিভাজনকে স্বীকার করে তাকে মানবিকভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। অতএব, এআই নিয়ে বর্তমান আতঙ্ক কেবল ভয়ের নয়, এটি আত্মসমালোচনারও। মানুষ আজ নিজের তৈরি সৃষ্টিকে দেখে নিজেকেই প্রশ্ন করছে—বুদ্ধিমত্তা কী, নৈতিকতা কী, মানবতা কী? অ্যালগরিদম যেন এক আয়না, যেখানে আমরা নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি—আমাদের আশা, ভয়, লোভ, আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি কোনো দানব নয়, কোনো ঈশ্বরও নয়; এটি মানুষেরই প্রতিফলন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এই নৈতিক আতঙ্ক হয়তো সময়ের সঙ্গে কমে যাবে, কিন্তু এর তোলা প্রশ্নগুলো চিরকাল টিকে থাকবে। মানুষ কতটা মানব থাকবে প্রযুক্তির যুগে? মানবিক মর্যাদা, সহানুভূতি ও ন্যায়ের ধারণা কি অ্যালগরিদমের কাছে টিকে থাকবে? সম্ভবত উত্তরের পথ প্রযুক্তি বর্জনে নয়, বরং তাকে মানবিকীকরণে। যদি এআই-ই হয় নতুন ধর্ম, তবে সেই ধর্মের ধর্মতত্ত্ব পুনর্লিখন করতে হবে—মানুষের সেবা, মর্যাদা ও নৈতিকতা রক্ষার নামে। প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ নয়, বোঝা শিখতে হবে; তাকে ভয় নয়, দিকনির্দেশ দিতে হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত, মানুষের হাতেই আছে সেই চিরন্তন নৈতিক দায়িত্ব—নিজের সৃষ্টিকে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাখা।

এভাবেই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ‘নৈতিক আতঙ্ক’ আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে—যেখানে মানুষ আবার খুঁজছে নিজের হারানো বিশ্বাস, নিজের মানবিক দিক। হয়তো একদিন আমরা শিখব, প্রযুক্তির ভেতরে ঈশ্বর খুঁজে নয়, বরং মানুষের ভেতরেই মানবতার চিরন্তন ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়।

● লেখক : গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

CS CamScanner

জলবায়ু সহনশীল কৃষি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য

ড. জাহাঙ্গীর আলম

আগামী ২০৩৫ সাল নাগাদ জিএইচজি নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাংলাদেশের খরচ হবে প্রায় ১১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ২৩ শতাংশ সংস্থান করবে দেশের সরকার। বাকি ৭৭ শতাংশ আসতে হবে বিদেশি অর্থায়ন থেকে

বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য চাহিদা। অন্যদিকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা। আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯ বিলিয়নে দাঁড়াবে। তখন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৭০ শতাংশ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব নেতিবাচক। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটির মধ্যে ১১০ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে। জলবায়ুর ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ। পোভার্টি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৮৮ কোটি মানুষ অন্তত একটি জলবায়ু সমস্যার সরাসরি সম্মুখীন। এর মধ্যে ৬০ কোটি চরম তাপে, ৫৭ কোটি দূষণে, ৪৬ কোটি বন্যায় এবং ২০ কোটি খরায় ভুগছে। এতে শিশুমৃত্যুর হার, বাসস্থান, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। ঘন ঘন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনের কারণে এরই মধ্যে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে কৃষির উৎপাদন। তা ছাড়া অবকাঠামো বিনষ্ট হচ্ছে। সাধিত হচ্ছে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৬.৭ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এ সময় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ২৮ শতাংশ ধান এবং ৬৮ শতাংশ গমের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। আর সমুদ্রপৃষ্ঠ ০.৬৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪০ শতাংশ উর্বর জমি ডুবে যেতে পারে। ফলে দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিতে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এখন আর প্রথাগত কৃষি প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অগ্রসরমাণ প্রযুক্তির। অনুসরণ করতে হচ্ছে ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার বা জলবায়ু অভিযোজিত, জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তির। এটি এমন একটি কৌশল, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। এর মূলে রয়েছে অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) কমানো।

বাংলাদেশে জিএইচজি নিঃসরণের পরিমাণ প্রায় ২৮১.৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমমান। এর গঠনে রয়েছে ৪৪.৮ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৪০.১ শতাংশ মিথেন এবং ১৩.১ শতাংশ নাইট্রাস অক্সাইড। মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের বেশির ভাগ নির্গমন হয় শস্য খাত ও পশুসম্পদ খাত থেকে। আমাদের বার্ষিক জনপ্রতি নিঃসরণ প্রায় ১.৬১ মেট্রিক টন কার্বন-ডাই অক্সাইডের সমমান। এনার্জি সেক্টর বা শক্তি খাত থেকে জিএইচজি নিঃসরণের মাত্রা বেশি, প্রায় ৫৫.৭ শতাংশ। শস্য, পশুপাখি, মৎস্য ও বন তথা সমন্বিত কৃষি খাত থেকে নিঃসরিত হয় ৩৭.৩৫ শতাংশ, আবর্জনা থেকে ১৪.২৬ শতাংশ এবং শিল্পপ্রক্রিয়া থেকে ৩.৩২ শতাংশ। এনার্জি খাতের কার্বন নিঃসরণ মূলত বিদ্যুৎ, যানবাহন, শিল্প, বসতবাড়িতে ব্যবহৃত শক্তি এবং ইটভাটা থেকে আসে। কৃষি খাত থেকে নিঃসৃত মিথেন প্রধানত ধান চাষ, গবাদি পশুর পাচকপ্রক্রিয়া ও মলমূত্র থেকে আসে। ইউরিয়া ও ডিএপি সারের প্রয়োগ থেকে নিঃসরিত হয় নাইট্রাস অক্সাইড। তা ছাড়া বনভূমি উজাড়, খড় পোড়ানো ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে আসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বর্তমানে ফসল খাত থেকে প্রায় ৪১ শতাংশ, পশুপালন খাত থেকে ৫২ শতাংশ এবং মৎস্য খাত থেকে প্রায় ৭ শতাংশ মিথেন নিঃসরিত হচ্ছে।

জিএইচজি নির্গমনের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে বলে এনডিসি বা ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান বা এনডিসি ৩.০ অনুসারে ২০৩৫ সাল নাগাদ শর্তহীনভাবে নিজস্ব প্রচেষ্টায় ৬.৩৯ শতাংশ জিএইচজি নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিদেশি অর্থায়ন ও সহায়তাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ১৩.৯২ শতাংশ কমানো হবে। মোট নির্গমন কমানোর পরিমাণ দাঁড়াবে ২০.৩১ শতাংশ। খাতওয়ারিভাবে শক্তিতে ২৬.৬৬ শতাংশ, শিল্পে ৭.৭১ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষিতে ১১.৪৬ শতাংশ জিএইচজি নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ফসল খাত, পশুপালন খাত ও মৎস্য খাত থেকে নিঃসরণ ক্রমাগত বেড়েছে।

কৃষি খাতে প্রশমন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, পশুপালন ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মাটির নিচে ইউরিয়া সার প্রয়োগ, মাটির এসিডিটি নিরসনে চুন ব্যবহার, পানি সেচের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল শুকানো ও ভেজানো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রিসিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নির্ধারণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পশুপালনের ক্ষেত্রে ভালো মানসম্পন্ন খাবার এবং উত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। পানি সেচ ও মৎস্য আহরণের ট্রলারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তির ধারণ করা হচ্ছে। তবে কৃষিতে জিএইচজি নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে সার্বিক প্রচেষ্টা এখনো সীমিত। গবেষণায় অগ্রগতি কম।

অভিযোজন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানো কর্মসূচি কৃষিতে বেশ দৃশ্যমান। এ ক্ষেত্রে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে তা ধারণের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বল্প জীবনকাল, লবণসহিষ্ণু, বন্যাসহিষ্ণু এবং খরাসহিষ্ণু বিভিন্ন ধানজাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এই জাতগুলোর উদ্ভাবক। গম, ভুট্টা, পাট ও নেপিয়ার ঘাসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ভাবন রয়েছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্র থেকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ পর্যন্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরে সময়ের ফারাক অনেক বেশি, যা কমানো সম্ভব। এ ছাড়া শস্য পর্যায়ক্রম, শস্য বহুমুখীকরণ, আন্ত ফসল চাষ এবং শস্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর। অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, মাটির ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় ফসলের পর্যায়ক্রম ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন—বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য একটি ফসল পর্যায়ক্রম এবং সমতলের জন্য অন্যটি দৃশ্যমান। এটি এমনভাবে অনুসরণ করা হয়, যাতে মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং পাশাপাশি অধিক ফসল ও অর্থনৈতিক লাভজনকতা নিশ্চিত করা যায়। এতে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যেমন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি দেশের কৃষিবিদ ও কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধিও পেয়েছে। এখনো নিট ফলাফল ইতিবাচক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। এর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের আর্থিক সহায়তা ও নীতিগত সমর্থন বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং সহনশীল প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করতে হবে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে অগ্রসরমাণ কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী, বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী এবং বেসরকারি ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো অর্থায়ন। এ নাগাদ জলবায়ু কর্মসূচির অর্থায়নে কৃষি খাতের হিস্যা খুবই কম।

আগামী ২০৩৫ সাল নাগাদ জিএইচজি নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাংলাদেশের খরচ হবে প্রায় ১১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ২৩ শতাংশ সংস্থান করবে দেশের সরকার। বাকি ৭৭ শতাংশ আসতে হবে বিদেশি অর্থায়ন থেকে। এই অর্থ জোগাড় করা বেশ কঠিন। এটি নির্ভর করবে বাংলাদেশের দর-কষাকষি করার দক্ষতার ওপর। নভেম্বর ২০২৫-এর ১০ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কপ-৩০ সম্মেলন। এতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরতে পারবেন। শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারবেন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ক্ষতি ও লোকসান সহায়তা আদায়ের জন্য। সে ক্ষেত্রে কৃষি মূল আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ

CamScanner

রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব ও শ্রমিকের করুণ আর্তি

চিররঞ্জন সরকার
গবেষক ও কলামিস্ট

> প্রত্যেক বেকার শ্রমিক একটি পরিবারের গল্প, প্রতিটি বন্ধ কারখানা একটি সমাজের ব্যর্থতার প্রতীক। তাই নীতিনির্ধারকদের উচিত এই সংকটকে কেবল পরিসংখ্যান নয়, একটি মানবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা। সরকারের পাশাপাশি শিল্পমালিকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের জীবন ও জীবিকা। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা আওয়াজ তুললেও জনমনে সংশয় দূর হচ্ছে না। বরং ফেব্রুয়ারি যতই এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক বিরোধ, অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতা ততই বাড়ছে। এর ফলে দেশের শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ ২০২৪ সালের আগস্টে দেশে 'বৈষম্য থাকবে না, কোটা থাকবে না, চাকরি হবে, কর্মসংস্থান হবে, শিল্প হবে'–এমন অনেক প্রতিশ্রুতির সুরে নতুন আশার আলো দেখেছিলেন বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু আজ সেই আশার প্রতিধ্বনি যেন এক নিষ্ঠুর প্রহসনে পরিণত হয়েছে। যে অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রতি অঙ্গীকার করেছিল বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের, বাস্তবে তা যেন উল্টো পথে হাঁটছে। বিশেষত, যাঁরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, সেই শ্রমিক শ্রেণি আজ কাজ হারিয়ে বেকারত্বের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন।

যে শ্রমিকেরা দিনের পর দিন কারখানার ধোঁয়া ও ঘামের গন্ধে নিজেদের জীবনকে নিঃশেষ করেছেন, সেই শ্রমিকদেরই এখন অন্নসংস্থানের অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছে। তাঁরা যাদের জন্য অর্থনীতি সচল, যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় 'মেইড ইন বাংলাদেশ' লেখা পোশাক বিদেশের বাজারে জায়গা করে নেয়, আজ সেই হাতগুলোই অব্যবহৃত, সেই মুখগুলোই ক্ষুধার্ত।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্প দীর্ঘদিন ধরে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান ভিত্তি। প্রায় ৪০ লাখ মানুষ সরাসরি এই খাতে কাজ করেন এবং আরও ২ কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গত ১৪ মাসের চিত্র যেন এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দলিল। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে ৩৫৩টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৪২ জন শ্রমিক কর্মহীন হয়েছেন। এই সংখ্যাগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়—এগুলো লক্ষাধিক পরিবারের চোখের পানি, অসহায়তার নীরব চিৎকার।

সবচেয়ে বড় আঘাত লেগেছে সাভারে, যেখানে ২১৪টি

যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় 'মেইড ইন বাংলাদেশ' লেখা পোশাক বিদেশের বাজারে জায়গা করে নেয়, আজ সেই হাতগুলোই অব্যবহৃত, সেই মুখগুলোই ক্ষুধার্ত। ছবি: সংগৃহীত

কারখানা বন্ধ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১২২টি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৩১ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। বড় কারখানাগুলোর মধ্যে যেমন ছেইন অ্যাপারেলস, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন বা সাফওয়ান আউটারওয়্যার—সবই আজ অতীতের নাম। এরপরের অবস্থান গাজীপুরে, যেখানে ৭২টি কারখানা বন্ধ হয়ে ৭৩ হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মহীন। বেক্সিমকো গ্রুপের ১৩টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া মানে শুধুই অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, বরং হাজার হাজার পরিবারের জীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসা। অবশ্য বেক্সিমকোর কারখানাগুলো আগামী মাসে চালু হচ্ছে। এতে ২৫ হাজার শ্রমিক আবার তাঁদের কাজ ফিরে পাবেন।

কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই ঢেউয়ের পেছনে আছে একাধিক কারণ—আন্তর্জাতিক বাজারের মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বায়ারদের অনিশ্চয়তা এবং স্থানীয় আর্থিক সংকট। বিদেশি ক্রেতারা নির্বাচিত সরকারের স্থিতিশীলতা না দেখে অর্ডার দিতে ভয় পাচ্ছেন, ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলো টিকতে পারছে না।

একদিকে অর্ডারের ঘাটতি, অন্যদিকে শ্রম আইন সংশোধনের মতো বিষয়গুলো মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের ওপর নতুন চাপ তৈরি করেছে। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়ে উৎপাদন কমাচ্ছে বা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু এসবের সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। তাঁরা হারাচ্ছেন চাকরি, হারাচ্ছেন আয়, হারাচ্ছেন মর্যাদা—সবচেয়ে বেশি হারাচ্ছেন জীবনের নিশ্চয়তা।

পোশাকশিল্পের এই সংকটে আরেকটি দুঃখজনক বিষয় একের পর এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড। গত ১৬ অক্টোবর চট্টগ্রামের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) অবস্থিত অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইলস লিমিটেড বা আল হামিদ টেক্সটাইলসে ভয়াবহ আগুনে ৯ তলা ভবনের ৫, ৬ ও ৭ তলা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১৭ ঘণ্টা ধরে চলা এই আগুনে পুড়ে গেছে বিপুল কাপড় ও কাঁচামাল। শত শত শ্রমিক হঠাৎ কাজ হারিয়েছেন। যদিও কর্তৃপক্ষ ৪৫ দিনের লে-অফ ঘোষণা দিয়ে বেতন চালু রাখার আশ্বাস দিয়েছে, বাস্তবে তা অনেক সময়ই ভেস্তে যায়। একটি কারখানার আগুন মানে শুধু ভবন পোড়া নয়, এটি শত শত স্বপ্নের মৃত্যু।

এর পরপরই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনে ৫১৬টি কারখানার প্রায় ১০০ কোটি টাকার স্যাম্পল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর প্রভাব সরাসরি পড়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থার ওপর। বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো যখন বাংলাদেশের উৎপাদনকাঠামোকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে, তখন নতুন অর্ডার স্থগিত বা বাতিল হয়, যার ফল ভোগ করেন শ্রমিকেরাই। বড় কারখানাগুলো হয়তো কোনোভাবে ধাক্কা সামলে নিতে পারে, কিন্তু ছোট কারখানাগুলোর জন্য এটি একরকম মৃত্যুঘণ্টা।

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) এক জরিপে দেখা গেছে, তৈরি পোশাক খাতে ৩২ শতাংশ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরিরও কম আয় করেন। এর চেয়ে ভয়াবহ তথ্য; ৭৮ শতাংশ শ্রমিক তাঁদের পরিবারকে পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না। অভাবের তাড়নায় প্রতি আটজনের মধ্যে একজন শ্রমিক ঋণের জালে আটকা পড়েছেন। এই পরিসংখ্যান কেবল অর্থনৈতিক নয়—এটি মানবিক ট্র্যাজেডি। যে মানুষটি ভোরে ঘর থেকে বের হয়ে সারা দিন মেশিনের শব্দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, রাতে ঘরে ফিরে সন্তানের মুখে খাবার দিতে না পারার কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখেন, তিনি কেবল শ্রমিক নন, তিনি এই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ সেই মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়ছে।

বাংলাদেশের কারখানাগুলোর বাস্তবতা আরও কঠিন। সাব-কন্ট্রাক্টেড ও মিশ্র ধরনের অনেক ফ্যাক্টরিতে ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি শিফট কাজ করা সাধারণ ঘটনা। আইনে যতই আট ঘণ্টা নির্ধারণ থাকুক, বাস্তবে তা প্রায়ই মানা হয় না। তদুপরি, শিশুশ্রম এখনো এই খাত থেকে নির্মূল হয়নি। শিশুশ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশই অনিয়ন্ত্রিত সাব-কন্ট্রাক্টেড কারখানায় কাজ করে। তাদের ৯৯ শতাংশ সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করে এবং অনেকেরই বয়সসংক্রান্ত নথি জাল করা হয়। এই নির্মম বাস্তবতা আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়—আমরা কীভাবে উন্নয়নের দাবিদার হতে পারি, যখন শিশুদের শৈশব পোশাকের কারখানার তাপে পুড়ে যায়?

যে শ্রমিকেরা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, এবার পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সেই আন্দোলনের পরও তাঁদের জীবনে কোনো আলো জ্বলেনি। বরং বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি ও ঋণের চাপে তাঁদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়েছে। তাঁদের এই হতাশা কেবল আর্থিক নয়, এটি মানসিকও। যখন একজন শ্রমিক তাঁর সন্তানের স্কুলের ফি দিতে পারেন না, যখন অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি শুধু একজন বেকার মানুষ নন, তিনি হয়ে ওঠেন সমাজের এক অদৃশ্য আর্তনাদ।

বেকারত্ব শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি সমাজের স্থিতি ও শান্তির প্রশ্ন। যখন লাখো শ্রমিক কাজ হারান, তখন শুধু তাঁদের পরিবার নয়, সমাজও অস্থির হয়। অভাব জন্ম দেয় সামাজিক অপরাধ, মানসিক ভাঙন ও প্রজন্মের হতাশা। আজ বাংলাদেশের তরুণসমাজও একই বাস্তবতায় আক্রান্ত। উচ্চশিক্ষিত তরুণেরা কাজ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা, অন্যদিকে অভিজ্ঞ শ্রমিকেরা কাজ হারিয়ে নিঃস্ব। একদিকে দক্ষ জনশক্তি দেশ ছাড়ছে, অন্যদিকে দেশীয় শ্রমবাজার সংকুচিত হচ্ছে। এই দ্বৈত সংকট ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ বার্তা।

এই সংকটের সমাধান কেবল অর্থনীতির ভাষায় সম্ভব নয়; দরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিটি বেকার শ্রমিক একটি পরিবারের গল্প, প্রতিটি বন্ধ কারখানা একটি সমাজের ব্যর্থতার প্রতীক। তাই নীতিনির্ধারকদের উচিত এই সংকটকে কেবল পরিসংখ্যান নয়, একটি মানবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা। সরকারের পাশাপাশি শিল্পমালিকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রমিককে কেবল উৎপাদনের হাতিয়ার নয়, মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হবে। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং ন্যূনতম জীবিকা নিশ্চিতে সরকার ও মালিকপক্ষের সমন্বিত পদক্ষেপ জরুরি। আন্তর্জাতিক বায়ার ও উন্নয়ন-সহযোগীদেরও এখানে ভূমিকা আছে। তারা শুধু 'কম দামে বেশি উৎপাদন' নয়, বরং 'মানবিক উৎপাদন'কে অগ্রাধিকার দিলে তবেই এই শিল্প টিকে থাকবে।

বাংলাদেশের শ্রমিকেরা কেবল অর্থনীতির চালক নন; তাঁরা জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রতীক। কিন্তু আজ সেই প্রতীকের ওপরই আঘাত লেগেছে। যদি আমরা এই সংকটকে উপেক্ষা করি, তাহলে শুধু শ্রমিক নয়, রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেকারত্বের অভিশাপ কেবল অর্থনৈতিক বিপর্যয় নয়—এটি এক মানবিক বিপর্যয়। তাই এখনই সময় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার, শ্রমিকের কণ্ঠ শোনার, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর। অর্থনীতির পরিসংখ্যান হয়তো কিছু সময় পর পাল্টে যাবে, কিন্তু এক শ্রমিকের কান্না যদি সমাজের বিবেকে না পৌঁছায়, তবে উন্নয়নের সব দাবি অর্থহীন হয়ে পড়বে। শ্রমিকের অশ্রু মুছে ফেলার দায়িত্ব আমাদের সবার। মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রথমে মানবিক চোখে শ্রমিককে দেখতে শিখতে হবে।

CamScanner

বিশ্ববাজার বদলে যাচ্ছে, বাংলাদেশ কি প্রস্তুত?

মাসুদ রানা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের ইতিহাসে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান নিঃসন্দেহে অনন্য। গ্রামীণ নারীশক্তিকে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করা থেকে শুরু করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হওয়া পর্যন্তড় এই খাত দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখেছে, লাখ লাখ মানুষের জীবনে আয় ও স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করছেড়কেবল একটি খাতের ওপর নির্ভর করে কি বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে?

বৈশ্বিক অর্থনীতি এখন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উৎপাদন ব্যয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনড়সব কিছুই বাজারের আচরণকে প্রায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় একমুখী রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতিতে। তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আজ বাংলাদেশের জন্য সেই ঝুঁকির বাস্তব উদাহরণ। আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাকের গড় মূল্য কমছে, ক্রেতাদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়ছে, এবং কাঁচামাল আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মুনাফার পরিমাণ কমে আসছে স্বভাবতই। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের সংকট, পশ্চিমা বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া কিংবা মহামারির পরে অর্থনৈতিক ধকলড়এসব ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে একক খাতনির্ভরতা অর্থনীতিকে কত সহজেই অস্থিরতার মুখে ঠেলে দিতে পারে।

বাংলাদেশ যখন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, সেখানে আয় ও প্রবৃদ্ধির উৎস হতে হবে বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র নিম্নমূল্যের পোশাক রপ্তানি দিয়ে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতার মধ্যেই তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনার দ্বারড়যেসব খাত এখনই সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করতে পারে।

ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারে নতুন পরিচিতি দিয়েছে। দেশের ৯৮ শতাংশ ওষুধ আমরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করিড়এটি শুধু শিল্প সক্ষমতা নয়, আত্মনির্ভরতার সুস্পষ্ট সূচক। বাংলাদেশ এখন প্রায় ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব আইন থেকে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা উন্নতমানের ও নতুন ওষুধ তুলনামূলক কম খরচে উৎপাদনের সুযোগ দিচ্ছে। যদি আমরা নিয়মকানুনের মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন ও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারি, তবে এই খাত বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোর নতুন প্রধান স্তম্ভে পরিণত হতে পারে।

একই সঙ্গে হালকা প্রকৌশল শিল্প বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সুযোগ। দেশের ভেতরেই লোহা, ধাতব জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালি পণ্য, মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলি, সোলার প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রাংশের বিশাল বাজার রয়েছে। ওপর দিয়ে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পরিবর্তনড়বিশেষত 'চায়না প্লাস ওয়ান' কৌশলড়অনেক দেশে বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র খুঁজে নিতে বাধ্য করছে। এখানে বাংলাদেশ একটি বাস্তব পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি হালনাগাদ, ডিজাইন দক্ষতা বৃদ্ধি ও আরএন্ডডিতে (জ়উ) বিনিয়োগ। তথ্যপ্রযুক্তি ও ফ্রিল্যান্সিং খাত বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আমরা এখন বিশ্বের অন্যতম বড় ফ্রিল্যান্সিং হাব। কিন্তু সময় এসেছে আরো উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কাজের দিকে এগোনোরড়সফটওয়্যার উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও আউটসোর্সিং খাতে বিনিয়োগ করা গেলে এই খাত বছরে বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

কৃষি-প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পও রপ্তানি বৃদ্ধির বাস্তব ক্ষেত্র। আমাদের কৃষি উৎপাদন শক্তিশালী, কিন্তু মূল্য সংযোজনের ঘাটতি রয়েছে। আধুনিক কোল্ড চেইন, খাদ্য নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন ও আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং ব্যবস্থার উন্নতি হলে হিমায়িত খাবার, ফল, সবজি, মসলা ও রেডি-টু-কুক খাদ্য বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি খাতে পরিণত হতে পারে।

সুতরাং, সম্ভাবনার পরিধি বিস্তৃত। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নড়আমরা কি এই সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রস্তুত? সম্ভাবনা আছে, বাজার আছে, মানবসম্পদও আছেড় এখন প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নীতি, দক্ষ এবং ব্যবহারিক মানবসম্পদ তৈরি করা, ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজ করা এবং আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষতার ঘাটতি। শিক্ষাব্যবস্থা এখনো মুখস্থনির্ভর সনদকেন্দ্রিক; এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা শিক্ষার্থীদের বড় অংশই বাজারের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। নীতিগত জটিলতা এবং প্রশাসনিক বিলম্ব বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে। পাশাপাশি বন্দর ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা দেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাকে কমিয়ে দেয়।

> বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য বন্দর, রেল ও মহাসড়ক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। একটি পণ্য উৎপাদনের খরচ যত কমই হোক, যদি তা দ্রুত ও সাশ্রয়ীভাবে বাজারে পৌঁছে তা বৃদ্ধি, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর দ্রুত বাস্তবায়ন, রেলওয়ে ও অভ্যন্তরীণ মালবাহী কাঠামো শক্তিশালী করাড়এসব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

এই জায়গাতেই বাংলাদেশকে নিতে হবে সুপরিকল্পিত ও দূরদর্শী উদ্যোগ। শুধুমাত্র সম্ভাবনার আলোচনা নয়, বরং বাস্তব কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। প্রথমেই আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি অর্জন করলেও শিল্পখাতের বাস্তবিক চাহিদার সঙ্গে তাদের দক্ষতার মৌলিক বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। শ্রমবাজারের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান, সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাড়এসব ক্ষেত্রেই বড় ঘাটতি রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে, পাঠ্যসূচি আপডেট করতে হবে এবং শিল্পখাতের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। শিল্প-সংযুক্ত ইন্টার্নশিপ এবং অ্যাপ্লাইড রিসার্চ বাধ্যতামূলক করা হলে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হওয়ার আগেই বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

একই সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি বরাদ্দ, পরিবেশ ছাড়পত্র, মূলধন অনুমোদন, কর পরিশোধ ও লাইসেন্সিংড়এগুলোর প্রক্রিয়া অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় জটিল ও দীর্ঘ হয়। এই আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা শুধু বিনিয়োগকারীর সময় ও খরচই বাড়ায় না, বরং বিদেশি বিনিয়োগের প্রতি নেতিবাচক বার্তা পাঠায়। তাই এখানে "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস"কে কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবিক অর্থে কার্যকর করা প্রয়োজন, যেখানে ব্যবসা শুরু করার প্রতিটি অনুমোদন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হবে, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হবে, এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত থাকবে।

এই নীতিগত সংস্কারের পাশাপাশি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে (ঝউত) সত্যিকার অর্থে শিল্পায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। এসব অঞ্চলে কেবল জমি বরাদ্দ দিলেই হবে না; সেখানে প্রয়োজন স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস, ইন্টারনেট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন সংযোগ এবং নিরাপত্তাড় সবকিছু আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা। একই সাথে, এসব অঞ্চলে কর অবকাশ ও বিনিয়োগ প্রণোদনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউশন স্থাপন করতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা শ্রমশক্তি নিয়োগে বাধার সম্মুখীন না হন।

পরিশেষে, বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য বন্দর, রেল ও মহাসড়ক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। একটি পণ্য উৎপাদনের খরচ যত কমই হোক, যদি তা দ্রুত ও সাশ্রয়ীভাবে বাজারে পৌঁছে তা বৃদ্ধি, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর দ্রুত বাস্তবায়ন, রেলওয়ে ও অভ্যন্তরীণ মালবাহী কাঠামো শক্তিশালী করাড়এসব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, কাস্টমস প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আধুনিক করা হলে লজিস্টিকস ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

বাংলাদেশ ইতিহাসের এমন এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনর্গঠিত হচ্ছে। চীন প্লাস ওয়ান কৌশলের কারণে অনেক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নতুন বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্রের সন্ধান করছে। এটাই বাংলাদেশের জন্য সুবর্ণ সুযোগড়যদি আমরা প্রস্তুত হতে পারি। সিদ্ধান্তটি এখন আমাদেরড়আমরা কি শুধু তৈরি পোশাকের দেশ হয়ে থাকব, না কি আগামীর শিল্প বিপ্লবে নিজেদের নতুন অবস্থান তৈরি করব।

দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন, নীতিগত স্থিতিশীলতা এবং সাহসড়এই পাঁচটি উপাদানই এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। এগুলো নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশ কেবল রপ্তানির বৈচিত্র্য অর্জনই করবে না, বরং এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে নাড়তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনই।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী
masud.news1@gmail.com

CS CamScanner

Bangladesh's rapid digital transformation should be safe

PRANTO CHATTERJEE

The modern Bangladeshi lives in a vast digital bazaar, where every reflection is made of data, numbers, and memories. We carry our savings on screens, our identities in invisible clouds, and our emotions through messages that rarely disappear. Technology promises speed, comfort, and access, but it also brings exposure. When awareness grows more slowly than adoption, the tools that empower can just as easily exploit. This is the paradox of our time, and Bangladesh stands squarely at its center.

The country's digital transformation has been remarkable. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission reports more than 134 million active internet connections and nearly 200 million mobile subscriptions. Internet penetration now exceeds 45 percent, compared to just 7 percent in 2010. Around 50 million citizens use social media, while more than 80 percent of urban adults rely on mobile financial services such as bKash or Nagad. Monthly mobile money transactions surpass Tk 1.5 trillion, a symbol of digital inclusion but also a growing source of vulnerability. Every transaction becomes a potential target, and every smartphone a possible point of entry for criminals.

Cybercrime is now a major frontier of insecurity. Bangladesh ranks among the top 25 most cyber-attacked countries, according to the Global Cybersecurity Index 2023. The Cyber Crime Investigation Division received more than 12,000 formal complaints in 2024, though experts believe the actual number is several times higher. Victims often remain silent due to stigma, fear of blame, or lack of trust in reporting systems. The crimes vary from financial fraud and identity theft to harassment and misinformation. The victims are ordinary citizens, yet the consequences are deeply personal and often devastating.

Women and young girls face the harshest impact. Advocacy reports and police data indicate over 9,000 cyber harassment complaints last year, involving stalking, blackmail, and digitally altered images. Nearly 70 percent of victims never report these crimes. Many perpetrators are not anonymous hackers but acquaintances misusing trust. The issue is not just technological but social: awareness, consent, and responsibility are still poorly understood.

Signs of vulnerability are visible everywhere. People leave unlocked phones on tea stall tables. Passengers read OTPs aloud on buses. Social media users post personal details freely, unaware of how they can be misused. Many still use the same password for every account or click on fake messages that begin with "Dear Customer." Even educated users download apps that request unnecessary permissions, unknowingly granting access to photos, contacts, and locations. Convenience has become a gateway for exploitation.

Financial fraud has grown rapidly. Bangladesh Bank has warned about rising phishing attempts, fake customer-care calls, and fraudulent apps. These scams rarely make headlines but collectively drain millions of taka. For low-income users, losing even a small amount can mean skipping meals. Most victims do not report these incidents, believing recovery is impossible, and this silence emboldens criminals.

Legal reforms have attempted to respond. The new Cyber Security Act replaced the Digital Security Act, reducing some penalties but retaining key provisions. Human rights groups still debate its balance between protection and free expression. Ordinary citizens, however, care less about legal language and more about whether authorities can help them promptly when they are victimized.

Institutional capabilities have expanded. The National Computer Incident Response Team monitors threats, and law enforcement maintains cyber units across major districts. Yet coordination is still weak. Victims often struggle to find the correct office, gather the required documents, or understand the reporting process. For those already distressed, such confusion becomes an added trauma.

Education is the strongest defense. Digital literacy should be considered as essential as traditional literacy. Schools must teach privacy, password safety, and online etiquette alongside regular subjects. Students should learn to identify phishing, understand encryption, and recognize the risks of oversharing. Universities should offer basic cybersecurity modules, and employers should conduct regular awareness workshops. Awareness must extend beyond urban centers to villages through community programs and local government initiatives.

Safety also begins at home. Families can take simple precautionary steps: enabling two-factor authentication, using different email accounts for different purposes, locking phones securely, avoiding public Wi-Fi for financial transactions, and updating software regularly. Parents should guide children on what not to share online, while elders must be taught to recognize scams disguised as prize offers or blocked-account warnings.

For women facing harassment, documentation and quick reporting are critical. Screenshots, links, and timestamps must be saved and presented to the Police Cyber Support for Women or nearest cybercrime division. NGOs such as BRAC and BLAST offer free legal and psychological support. The message must remain clear: silence protects perpetrators, not victims.

The government's ambition for a "Smart Bangladesh" requires equally smart cybersecurity measures. National databases need strong encryption, multi-layer authentication, and regular independent audits. A comprehensive Data Protection Act is necessary to ensure transparency, consent, and accountability in data handling. Cybersecurity should be recognized as a cornerstone of national security, not merely a technical concern.

Bangladesh has already demonstrated its ability to adapt and innovate. The same country that improved disaster management and pioneered mobile financial inclusion can build a culture of digital safety. The digital bazaar will only grow, but citizens can choose to navigate it confidently rather than fearfully. Awareness is not fear-it is freedom. If we learn to pause before clicking, verify before trusting, and report without hesitation, the future of digital Bangladesh can be a place where opportunity thrives and dignity is protected.

The writer is a student, MSc in Autonomous Vehicle Engineering at the University of Naples Federico II in Italy

CamScanner

বিশ্ব নেতাদের সম্মেলন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার পরীক্ষা: কপ-৩০

মোতাহার হোসেন

ব্রাজিলের বেলেম শহরে গত ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ও প্যারিস চুক্তির ৩০তম অধিবেশন হচ্ছে কপ৩০। এ সম্মেলন স্বাভাবিক নিয়মে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত চলার কথা। আমাজন অরণ্যের তীরে ব্রাজিলের বেলেমে এ সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ১৫০ দেশের প্রতিনিধি জলবায়ু সংকট মোকাবিলার পথ নির্ধারণে যূথবদ্ধ হয়েছেন। বিশ্ব নেতারা এমন এক সময়ে এই সম্মেলনে যোগ দিলেন , যখন বিশ্ব জলবায়ু সংকটের চরম পর্যায়ের মুখোমুখি। আমাজন পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণম-লীয় অরণ্য, যা প্রতি বছর বিলিয়ন টন কার্বন শোষণ ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে, এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, কূটনীতিক ও জলবায়ু আন্দোলনের কর্মীরা যখন এক ছাদের নিচে, তখনই জোরালোভাবে কিছু প্রশ্ন সামনে আসছে জলবায়ু সম্মেলনগুলো কি করপোরেটের আধিক্য ও পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ছে? বাস্তব অগ্রগতি আর সম্ভব হচ্ছে না?

সমালোচকরা বলছেন, জলবায়ু সম্মেলন এখন অনেকটা 'বাণিজ্য মেলা'য় রূপ নিয়েছে। আবার করপোরেট কোম্পানির প্রভাবে মূল উদ্দেশ্যই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। গত দুই কপ আয়োজন করেছে তেলনির্ভর স্বৈরশাসিত দেশ, যেখানে সভাপতিও ছিলেন জ্বালানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা। করপোরেট স্পন্সরশিপ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কপের স্পন্সর হচ্ছে দূষণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আজারবাইজানে বিগত কপে ছিলেন এক হাজার ৭৭০ জন জীবাশ্ম জ্বালানি-লবিস্ট। তাদের প্রভাবে কয়লা, তেল ও গ্যাসনির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো ভেস্তে যায়। ফলে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার নেতৃত্বে দেশটি বন উজাড় রোধ ও পরিবেশ রক্ষা এবং পুনরুদ্ধারে নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাজেই আয়োজক হিসেবে ব্রাজিলের কৌশলগত দায়িত্ব হলো গ্লোবাল সাউথকে একীভূত করে ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠ তোলা। আমাজনের ভাগ্য আসলে পৃথিবীর ভাগ্যই নির্ধারণ করবে আমরা কি পৃথিবীর ফুসফুস রক্ষা করব, নাকি উদাসীনতায় নিজেরাই এর গলা টিপে মারবো ?

প্রসঙ্গত: ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত "আর্থ সামিট"-এর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে জলবায়ু আলোচনার মূল কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর ১৯৯৫ সালে প্রথম কপ (COP1) ম্মেলন জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়। গত তিন দশকে কপ সম্মেলনগুলো বিভিন্ন মাইলফলক তৈরি করেছে যেমন ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রোটোকল, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি, এবং ২০২৩ সালের কপ২৮ দুবাই সম্মেলনের লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের সূচনা।

প্রসঙ্গত: প্যারিস চুক্তি সইয়ের দশ বছর পরও বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য সময়ের আবর্তে ধীরে ধীরে অসম্ভব ও কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এখনো এ নিয়ে চরম বিভক্ত রয়েছে। একই ভাবে জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে রেকর্ড উষ্ণতা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তীব্র গরম ও অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে মানুষ ও ধরিত্রীকে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু সংকট সৃষ্টি না করেও এর চরম প্রভাব ভোগ করছে। এমন পরিস্থিতিতে কপ৩০ সম্মেলন শুধু ন্যায্যতার নিবেদনই নয়, বরং এটি এক ধরনের পরীক্ষাও যে, বৈশ্বিক জলবায়ু ব্যবস্থার কার্যকারিতা কতটুকু। কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে বিশ্ব মোড়লদের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অনৈক্য, মতবিরোধ, অর্থনৈতিক ধীরগতি, করপোরেট আধিপত্য এবং শক্তিধর দেশের চাপে প্রত্যাশা আগের চেয়ে অনেক কম। এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে কপ৩০ কি আন্তর্জাতিক জলবায়ু কূটনীতির ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে। নাকি আবারও প্রতিশ্রুতির ফানুস হয়ে চুপসে যাবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিন দশকের পুরোনো এই সম্মেলন এখন অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক হয়ে পড়েছে, যা বাস্তব পদক্ষেপ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তাদের মত, সময় এসেছে পুরো প্রক্রিয়া পুনর্গঠনের। জলবায়ু সম্মেলনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে এবং দীর্ঘ প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থ দ্রুত ছাড়ের দাবি তুলছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল সম্পূর্ণ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো সরাসরি এই তহবিল থেকে সহজে অর্থ পেতে পারে। অন্য অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করা, ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিশ্চিত করা, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার এবং গ্লোবাল স্টকটেক প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি যুক্ত করা।

এমনি এক কঠিন বাস্তবতায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ জলবায়ু ন্যায়বিচারে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। তবে বিশ্বকে এখনই ন্যায্য অর্থায়ন ও অভিযোজন সহায়তা দিতে হবে। প্রতিশ্রুতির সময় শেষ, এখন দরকার বাস্তব পদক্ষেপ। প্যারিস চুক্তির এক দশক পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ পায়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা কমছে, আর্থিক অঙ্গীকার ঝুলে আছে। বিশ্ব আজ এমন এক টার্নিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, হিমবাহ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, ঝড়, অগ্নিকাণ্ড সবকিছুই এখন এক ভয়াবহ বাস্তবতা। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০২৫ সালের জাতিসংঘের ৩০তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩০) ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য "বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা" অর্থাৎ, আগের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং উন্নত দেশগুলোর আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

> জলবায়ু সম্মেলন এখন অনেকটা 'বাণিজ্য মেলা'য় রূপ নিয়েছে। আবার করপোরেট কোম্পানির প্রভাবে মূল উদ্দেশ্যই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। গত দুই কপ আয়োজন করেছে তেলনির্ভর স্বৈরশাসিত দেশ, যেখানে সভাপতিও ছিলেন জ্বালানি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা

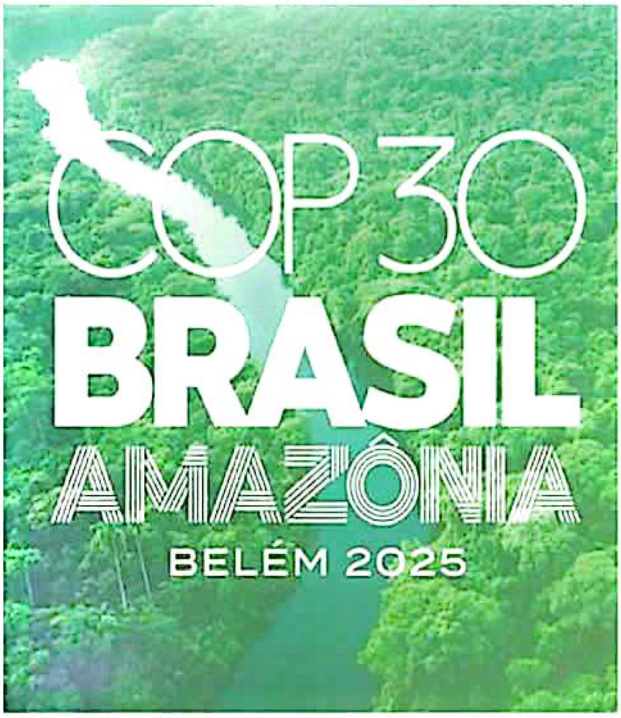

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার তথ্য, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়কাল ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম। দাবানল, তীব্র গরম, বন্যা, খরা ও ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। আর্কটিক থেকে আমাজন পর্যন্ত প্রকৃতির নাজুক ভারসাম্য ভেঙে পড়ার উপক্রম। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, মানবজাতি যেন "নিজ গ্রহের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণ করছে। কারণ বিশ্বকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার উষ্ণতা রোধে ব্যর্থতা আমাদের সকলের "নৈতিক ব্যর্থতা ও প্রাণঘাতী অবহেলা"।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বর্তমান নিঃসরণ প্রবণতা যে বিশ্ব ২.৩ ডিগ্রি বা তার বেশি উষ্ণতার দিকে এগোচ্ছে যা নিরাপদ সীমার অনেক উর্ধ্বে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে ভয়াবহ পরিণতি হবে। তখন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নিম্নভূমি দেশগুলোর বিলুপ্তি, জীববৈচিত্র্যের অপূরনীয় ক্ষতি, বিশাল জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব যখন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসছে, তখন কয়লা, তেল ও গ্যাস শিল্পনির্ভর লাখো শ্রমিক ও সমাজকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পদক্ষেপকে দারিদ্র্য হ্রাস ও টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তাই কপ৩০-এ প্রতিটি সিদ্ধান্তে ন্যায় ও সমতা থাকতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল।

জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.৫% এরও কম হলেও বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের একটি। সরকারি হিসাবে, বাংলাদেশকে প্রতিবছর অভিযোজন কার্যক্রমে প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবে পায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও কম যা বৈশ্বিক জলবায়ু রাজনীতির নির্মম বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ। তবুও বাংলাদেশ তার সক্ষমতা, নিজস্ব অর্থায়ন, উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা নিয়ে ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশেষ করে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান ২০২৩- ২০৫০, ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি), দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, উপকূলীয় বনায়নায়নের উদ্যোগে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অভিযোজন নেতৃত্বের প্রতীক।

কপ ৩০-এ বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর কেবল নিজ দেশের স্বার্থ নয়, বরং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত দাবি ন্যায্যতা, অর্থায়ন ও ন্যায়ভিত্তিক রূপান্তর। ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত লস এন্ড ডেমেজ ফান্ড কে দুর্বল দেশগুলোর জন্য বিজয় বলা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। প্রশাসনিক জটিলতা ও অর্থের ঘাটতি এর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশের দাবি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জন্য সরাসরি অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন,তা ঋণ নয়। বর্তমান ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য বাড়িয়ে অন্তত অর্ধেক অর্থ অভিযোজন খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। কারণ অভিযোজনই জীবিকা রক্ষা করে, অর্থনীতি টিকিয়ে রাখে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ রাখে। বাংলাদেশের অগ্রাধিকার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, লবণসহিষ্ণু ফসল, উপকূলীয় বাঁধ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এসবই জীবনের সঙ্গে জড়িত।

সম্মেলনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে অন্তর্ভুক্তির ওপর। কারণ জলবায়ু ন্যায়বিচার মানে শুধু তাপমাত্রা নয়, মানব মর্যাদার প্রশ্নও। বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধি দল কপ ৩০-এ নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করবে জোট গঠন: ব্রাজিল,জি ৭৭+চায়না ও এলডিসি গ্রুপের সঙ্গে সমন্বয় করা। অর্থায়ন দাবি: বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার; যার অন্তত ৫০% অভিযোজন খাতে। লস এন্ড ডেমেজ ফান্ডের সরাসরি সুবিধা গ্রহণ এবং শর্তহীন তহবিল প্রাপ্তির দাবি। জাস্ট ট্রানজিশন এজেন্ডা: সামাজিক সুরক্ষা, লিঙ্গসমতা ও কর্মসংস্থান যুক্ত রূপান্তর পরিকল্পনা। একই সঙ্গে কার্বন মার্কেট অংশগ্রহণ: ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণে আর্টিকেল ৬ অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ , তবে অর্থায়নের বিকল্প নয়, পরিপূরক হিসেবে। এই কৌশল বাংলাদেশের অবস্থানকে "ক্ষতিগ্রস্ত দেশ" থেকে "সক্রিয় নেতৃত্বের দেশ"-এ রূপান্তর করেছে।

অন্যদিকে,বহু শক্তিশালী শিল্প উন্নত দেশ এখনো জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে বাধা দিচ্ছে। বরং তারা " মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কাগুজে সমাধা যেমন কার্বন ক্যাপচার, ব্লু হাইড্রোজেন, ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্রচার করছে, যা প্রকৃত নিঃসরণ হ্রাস করে না। তাছাড়া যে অর্থ প্রতিশ্রুত হয়, তা প্রায়ই প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে যায় কঠোর শর্তে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাই সরাসরি অর্থপ্রাপ্তির দাবি জানাচ্ছে। বিশ্বকে এখন জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে গ্লোবাল পাবলিক গুডস হিসেবে দেখতে হবে বিশেষ অধিকার নয়, মানবাধিকারের অংশ হিসেবে। কপ৩০ কেবল নীতি আলোচনা নয়, এটি মানবতার নৈতিক সাহসের পরীক্ষা। উষ্ণতার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ মানে আরও বন্যা বাংলাদেশে, আরো খরা আফ্রিকায়, আরও অগ্নিকান্ড আমাজনে, আরও বাস্তুচ্যুতি পৃথিবীব্যাপী। বাংলাদেশের জন্য এই পরিণতি অস্তিত্বের প্রশ্ন। জলোচ্ছ্বাস কেবল জমি নয়, শতাব্দীর সংস্কৃতিও মুছে দিতে পারে। বিশ্বের জন্য ব্যর্থতা মানে ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাহলে কপ ৩০ আবারও বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, মানবতাকে টেকসই ভবিষ্যতের পথে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এসব বিষয়ে ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারে বিশ্ব নের্তৃবৃন্দ তা হলে এর ফলাফল যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হবে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য, এবং জীবনের নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরনে। আর 'যদি কপ-৩০ বাস্তব ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়, এটি শুধু কূটনৈতিক ব্যর্থতা হবে না এটি হবে মানবতার ব্যর্থতা।'

লেখক: সম্পাদক-ক্লাইমেট জার্নাল২৪.কম
এবং সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট
চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম (বিসিসিজেএফ)

CamScanner

From Vulnerability to Vanguard: Shifting Bangladesh's Garment Story at COP30

Mamunur Rahman

> *Bangladesh must seize the COP30 platform to make a compelling call for an inclusive Circular Economy transition fund. The message to developed nations and multilateral bodies is clear: Do not just fund adaptation, fund the solution. We need concessional climate finance and technical assistance to build the advanced recycling infrastructure needed to process Jhut*

Laizu Begum's life is a testament to the brutal, cascading impacts of climate change. Hailing originally from Bhola, the low-lying island district perpetually battered by rising tides, Laizu lost her ancestral land and home to the mighty Meghna River. This climate displacement forced her, like millions of others, to migrate to the burgeoning industrial belt of Gazipur, near Dhaka. Here, she found work sorting textile scraps, or Jhut, from the vast Ready-Made Garment (RMG) factories. Though she escaped the river's immediate wrath, her dwelling in the low-lying periphery of the city means she remains tragically vulnerable to urban flooding–a modern consequence of a warming world.

Laizu's existence embodies the core dilemma of Bangladesh: she is among the most climate-vulnerable people on Earth, yet her daily work quietly contributes to a global climate solution. For years, her meagre, erratic wages as a Jhut collector were barely enough, and she relied on unhygienic alternatives for menstrual care. But today, Laizu is a trained member of the Ella Alliance. She sorts high-quality fabric remnants and, more importantly, uses these scraps to manufacture Ella Pads–affordable, reusable, and hygienic sanitary napkins.

Laizu is not just managing waste; she is creating a carbon handprint. Every pad she makes cuts down on polluting landfill waste, reduces the need for resource-intensive virgin fibre for commercial pads, improves the health of her peers, and secures her own sustainable income. Her story is the powerful lens through which the world should view Bangladesh at the 30th Conference of the Parties (COP30) in Belém, Brazil.

The Two Faces of Bangladesh at COP30

Global leaders at COP30 will inevitably view Bangladesh as a nation requiring massive climate finance to adapt–the undisputed poster child of vulnerability. This narrative is accurate, but incomplete. The story of Laizu and the RMG sector offers a second, more empowering narrative: Bangladesh as a Climate Solution Partner.

The country's RMG industry is the second largest globally, producing an estimated 6,00,000 metric tons of pre-consumer textile waste (Jhut) annually. This waste is a massive environmental liability, but in the hands of people like Laizu, it becomes a strategic national asset for the Circular Economy. The true opportunity lies in demonstrating how Bangladesh is ready to close the loop on textiles, turning its biggest waste stream into a renewable resource.

Scaling the Circular Handprint: Laizu and the Ella Alliance

The Ella Pad initiative is the perfect microcosm of the systemic change required, and its success is driven by its distribution model, the Ella Alliance. As a member, Laizu has transformed from a Jhut processor into a micro-entrepreneur and community health advocate. Her work involves two crucial steps: she uses textile waste to produce the affordable, reusable Ella Pads, transforming scrap into a health product; and critically, she actively sells these pads and sensitises other fellow women and girls in her marginalised community about Menstrual Hygiene Management (MHM).

This duality of her role directly addresses social injustice. By ensuring access to low-cost, effective MHM solutions, Laizu helps women and girls who previously had to miss work or school due to lack of hygiene products to participate fully in the economy and education. This shift increases their earning potential and educational attainment, unlocking their full economic participation. The income Laizu earns, combined with the higher productivity of the women she helps, generates localised economic resilience–a vital shield against future climate-related shocks.

A Call to Action for COP30: Invest in the Handprint

Bangladesh must seize the COP30 platform to make a compelling call for an inclusive Circular Economy transition fund. The message to developed nations and multilateral bodies is clear: Do not just fund adaptation, fund the solution. We need concessional climate finance and technical assistance to build the advanced recycling infrastructure needed to process Jhut. International buyers and regulatory bodies must recognise the positive carbon handprint created by using verified Bangladeshi recycled Jhut with preferential trade treatment. Finally, direct capital must flow towards grassroots social businesses to ensure the circular transition is a Just Transition that puts women like Laizu – displaced by the Meghna but now building a greener economy in Gazipur – at the very centre of the economic shift. Her transformation from a climate refugee to a circular economy champion proves that climate action and prosperity are inseparable.

The writer is the Founder, Ella Pad, and Coordinator, Ella Alliance. He can be reached at: ella.mamunur@gmail.com

CamScanner

Is AI Going to Have Devastating Impact on White-collar Jobs?

Nironjan Roy

The application of AI (artificial intelligence) has now been widespread in the corporate world and caused menace to many employees. Since the start of the use of this super-advanced technology, there has been strong speculation that massive job cuts might take place, which is now going to be true. When a pilot project was undertaken, followed by gradual AI rollover, the job cuts started. At that time, the senior management was extremely cautious about this issue. However, the job-cutting situation is now quite visible. The senior management of most companies are pursuing a strategic approach to ensure smooth AI transformation without creating scary situations at workplaces.

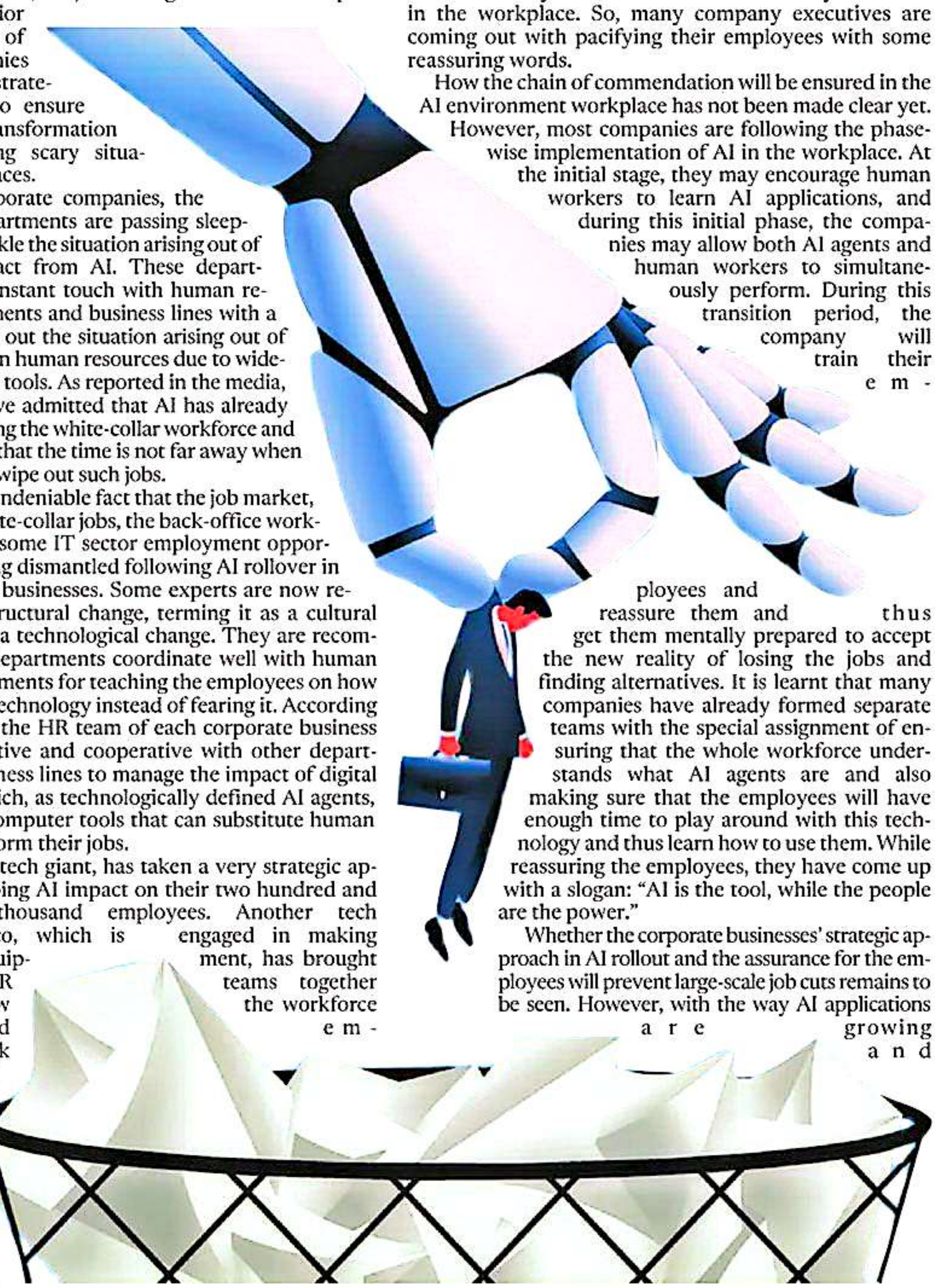

In most corporate companies, the technology departments are passing sleepless nights to tackle the situation arising out of workforce impact from AI. These departments are in constant touch with human resources departments and business lines with a view to figuring out the situation arising out of sudden change in human resources due to widespread use of AI tools. As reported in the media, many CEOs have admitted that AI has already started destroying the white-collar workforce and also mentioned that the time is not far away when technology will wipe out such jobs.

It is now an undeniable fact that the job market, particularly white-collar jobs, the back-office workforce and even some IT sector employment opportunities are being dismantled following AI rollover in most corporate businesses. Some experts are now redefining this structural change, terming it as a cultural shift instead of a technological change. They are recommending tech departments coordinate well with human resource departments for teaching the employees on how to use the new technology instead of fearing it. According to their advice, the HR team of each corporate business should be assistive and cooperative with other departments and business lines to manage the impact of digital co-workers, which, as technologically defined AI agents, are advanced computer tools that can substitute human workers to perform their jobs.

> *It is now an undeniable fact that the job market, particularly white-collar jobs, the back-office workforce and even some IT sector employment opportunities are being dismantled following AI rollover in most corporate businesses. Some experts are now redefining this structural change, terming it as a cultural shift instead of a technological change*

Microsoft, a tech giant, has taken a very strategic approach for shaping AI impact on their two hundred and twenty-eight thousand employees. Another tech company, Cisco, which is engaged in making networking equipment, has brought their IT and HR teams together to work out how the workforce of 86 thousand employees will look with a virtual staff of entities. In consequence of AI application, significant job-cutting has already started. Microsoft laid off 9,000 workers in July in addition to the earlier elimination of 6,000 staff last May. PricewaterhouseCoopers have laid off 150 employees in their marketing, human resources, operations and other support functions. It is also learnt that more significant job cuts are expected from big accounting firms in the coming months.

As reported in the media, US companies had planned to slash 153,074 jobs last October, which was almost three times the number of job cuts that happened in September. This huge amount of job cuts in any single month was stated to be the dual impact of cost control and applying AI tools.

The AI menace has gripped the working environment, and the way AI application is growing in the workplace, and as incremental job cuts are happening, the employees of most companies fear losing their jobs. Senior management of many companies are getting severely concerned about the company's performance as well as delivery of tasks because of such scary situations in the workplace. So, many company executives are coming out with pacifying their employees with some reassuring words.

How the chain of commendation will be ensured in the AI environment workplace has not been made clear yet. However, most companies are following the phase-wise implementation of AI in the workplace. At the initial stage, they may encourage human workers to learn AI applications, and during this initial phase, the companies may allow both AI agents and human workers to simultaneously perform. During this transition period, the company will train their employees and reassure them and thus get them mentally prepared to accept the new reality of losing the jobs and finding alternatives. It is learnt that many companies have already formed separate teams with the special assignment of ensuring that the whole workforce understands what AI agents are and also making sure that the employees will have enough time to play around with this technology and thus learn how to use them. While reassuring the employees, they have come up with a slogan: "AI is the tool, while the people are the power."

Whether the corporate businesses' strategic approach in AI rollout and the assurance for the employees will prevent large-scale job cuts remains to be seen. However, with the way AI applications are growing and taking the jobs of human workers, the majority of officials' jobs are feared to be either eliminated or replaced by digital workers within the next three to five years. Whatever the consequence of AI rollout in the workplace, this technology may cause great havoc in the job market with a devastating impact on white-collar jobs.

The writer is a certified anti-money laundering specialist and banker based in Toronto, Canada. Email: nironjankumar_roy@yahoo.com

CamScanner

COP30 and the Forgotten Frontline: Why Bangladesh Must Treat Climate Change Crisis as a National Security Priority

Emran Emon

When the world's leaders, scientists, and climate negotiators gather in Belém, Brazil, this November (from 10 to 21 November 2025) for COP30, the agenda will once again center on the planet's most existential threat—climate change. COP30 refers to the 30th meeting of the Conference of the Parties (COP) under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a landmark international treaty adopted in 1992 and the foundational framework for the 2015 Paris Agreement.

The UN Climate Change Conference, or the Conference of the Parties (COP), is the only multilateral decision-making forum where nearly every nation on Earth deliberates on how to limit global temperature rise to 1.5°C, adapt to irreversible climate impacts, and achieve net-zero emissions by 2050. But as global leaders debate pledges and frameworks, Bangladesh stands as a case study of both human resilience and governmental apathy—a nation at the epicenter of the climate crisis, yet paralyzed by inaction. Once hailed as a model for adaptation, Bangladesh now risks becoming a tragic symbol of neglect, as its policymakers continue to treat climate change as an environmental issue, not a national security or survival crisis.

Bangladesh's geography is its greatest curse. Crisscrossed by more than 700 rivers, the country lies at the mouth of the mighty Ganges-Brahmaputra-Meghna delta—one of the world's largest river systems and, tragically, one of its most climate-vulnerable zones. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) repeatedly warns that a 1-meter rise in sea level could submerge 17% of Bangladesh's land, displacing nearly 30 million people. The World Bank projects that by 2050, climate change could internally displace 13 million Bangladeshis, creating one of the largest populations of "climate refugees" in modern history.

This is not theoretical. In Satkhira, Khulna, and Bhola, saltwater intrusion has already poisoned groundwater and farmland, forcing thousands to abandon ancestral homes. Coastal women are suffering from fertility issues due to saline-contaminated drinking water. In the country's north, severe droughts are destroying paddy yields. In the east, flash floods are now frequent and unpredictable. Bangladesh's climate crisis is not a future forecast—it is a lived reality. And yet, policy attention remains startlingly minimal.

The United Nations Development Program (UNDP) and the UN Environment Program (UNEP) have issued repeated warnings: Bangladesh is among the top 10 most climate-vulnerable countries globally. According to the Global Climate Risk Index, it ranks seventh in long-term vulnerability.

The UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) cautioned that Bangladesh's "adaptation achievements" are being outpaced by the scale of new threats—notably extreme heat, tidal surges, riverbank erosion, and slow-onset disasters such as salinization and desertification. In 2024, the World Bank reported that heat-related productivity losses cost Bangladesh $1.8 billion—about 0.4% of GDP—in just one year. The UNEP Emissions Gap Report (2024) further warned that unless Bangladesh integrates mitigation with adaptation, its economic growth could shrink by up to 30% by 2050 due to climate-induced disruptions. The international alarm is clear. What's unclear—and unforgivable—is why Dhaka remains so complacent.

Bangladesh's ruling elites treat climate change as a side note, a "development" topic rather than a survival imperative or a national agenda. The country has produced strategies—Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), Delta Plan 2100, and a National Adaptation Plan—but most exist on paper. There is no comprehensive implementation architecture, no independent oversight, and no climate accountability mechanism integrated into governance or fiscal policy.

Three structural failures stand out:

Bureaucratic Fragmentation: Climate action is scattered across ministries—the Ministry of Environment drafts plans, but Finance controls budgets, and Local Government implements projects. The result? Disjointed action and duplication.

Chronic Underfunding: Bangladesh spends less than 1% of GDP annually on climate adaptation, far below the estimated 3% needed. While the government often blames "insufficient international finance," it continues to pour billions into carbon-intensive infrastructure projects, including coal and LNG-based power plants.

Policy Distraction and Political Denial: For over a decade, political discourse has been consumed by power struggles and regime survival, not planetary survival. Climate change rarely features in national electoral debates or parliamentary agendas. The silence is deafening.

The government's "growth-first" obsession has created a paradox: economic progress built on ecological and climate collapse. As rivers vanish, coastlines retreat, and cities choke, the national narrative still celebrates GDP growth—an illusion increasingly detached from environmental reality. A decade ago, Bangladesh was celebrated globally as a climate adaptation pioneer. Community-based cyclone shelters, early warning systems, and microfinance for disaster recovery were hailed as models for vulnerable nations.

Today, that reputation has faded. The Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF)—once praised for its innovation—has been tainted by mismanagement and lack of transparency. Funds are routinely allocated to politically connected projects with little measurable impact. The Bangladesh Delta Plan 2100, theoretically a long-term vision to safeguard the delta from rising seas, has become a bureaucratic labyrinth with weak implementation and questionable sustainability.

Meanwhile, grassroots adaptation initiatives—run by NGOs and local communities—remain underfunded and isolated from national planning. Policymakers in Dhaka have failed to connect top-down strategy with bottom-up resilience. The result: Bangladesh is losing the race between adaptation and acceleration. The climate threats are evolving faster than the country's institutional response.

At present, in Bangladesh, climate change crisis is not just an environmental issue, it becomes a national security crisis. Here lies the fundamental misunderstanding: climate change in Bangladesh is not about "saving the environment." It is about saving the state. Unchecked, climate collapse will destabilize every pillar of national life:

Economy: Shrinking arable land will cripple agriculture, still employing 40% of the workforce.

Migration: Internal displacement will flood urban centers like Dhaka, aggravating unemployment, housing crises, and social unrest.

Health: Heatwaves, vector-borne diseases, and contaminated water will trigger new public health emergencies.

Security: Resource scarcity—water, land, and food—will heighten local conflicts, threatening internal stability.

Even the Bangladesh Armed Forces, long focused on disaster relief, now recognize climate as a "threat multiplier." But civilian leadership has yet to translate that understanding into comprehensive strategy.

As the world meets in Belém, Bangladesh must confront a simple truth: it cannot survive on sympathy—it needs strategy. To avoid becoming a climate tragedy, the country must urgently recalibrate along three fronts.

Treat Climate as the Core of Economic Planning: Climate policy cannot remain siloed within the Environment Ministry—it must be embedded into every budget and decision. Bangladesh needs a National Climate Accountability Act, mandating that every public investment pass a "climate resilience audit." Additionally, the Finance Ministry must reallocate subsidies from fossil fuels to renewable energy, green infrastructure, and resilient agriculture. A Bangladesh Climate Resilience Fund, jointly managed with UNDP and civil society, could ensure transparency and results-based financing.

Lead, Not Lament, in Global Negotiations: Bangladesh should arrive at COP30 not as a helpless victim, but as a moral and strategic leader among climate-vulnerable nations. Dhaka must demand: Concrete mechanisms under the Loss and Damage Fund for automatic compensation when climate thresholds are breached. Technology transfers for renewable energy and water management. Direct financing for locally-led adaptation, bypassing slow multilateral bureaucracy.

Mobilize Society, Not Just Government: Real resilience will not come from ministries—it will come from the grassroots. Bangladesh must mobilize youth, private sector innovators, and local communities into a national climate corps focused on reforestation, coastal restoration, and clean energy innovation.

Environmental education must become mandatory across all schools, colleges and universities to build generational awareness. Media, too, has a vital role—to transform climate coverage from seasonal disaster reporting to sustained policy scrutiny.

Bangladesh's tragedy is not its geography—but its governance. The land may be doomed to floods and cyclones, but the real flood is of indifference, the real storm is of negligence. As the UN rings alarm after alarm, Dhaka's silence borders on moral failure. The nation that once inspired the world with its resilience now risks becoming the epicenter of catastrophe for showing indifferences in climate change crisis.

The climate crisis is rewriting Bangladesh's history in real time—its rivers drying, its coasts retreating, its people displaced. The question is not whether the world will act, but whether Bangladesh will act for itself. Without domestic political will and international accountability, Bangladesh risks becoming a permanent state of suffering—where the global South experiments in survival while the global North debates emissions arithmetic. At COP30, the world will talk of promises. Bangladesh must talk of survival. Because for this nation of rivers and resilience, inaction is not apathy—it is suicide.

Emran Emon is a journalist, columnist and a global affairs analyst.

CamScanner